মোহন রায়ের বাঁশি • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ



মোহন রায়ের বাঁশি

মোহন রায়ের বাঁশি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : দেবাশীষ দেব



আ ন ন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪ মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৮ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

ISBN 81-7756-391-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

৬০.০০

"রা-স্বা"

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

শ্রীমতী সুজনা মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়াসু
শ্রীমান যুধাজিৎ মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েসু



ময়নাগড়ের দিঘির ধারে সন্ধেবেলায় চুপটি করে বসে আছে বটেশ্বর। চোখে জল, হাতে একখানা বাঁশি। পুবধারে মস্ত পূর্ণিমার চাঁদ গাছপালা ভেঙে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করছে। দিঘির দক্ষিণ দিককার নিবিড় জঙ্গল পেরিয়ে দখিনা বাতাস এসে দিঘির জলে স্নান করে শীতল সমীরণে পরিণত হয়ে জলে হিলিবিলি কাঁপন তুলে, বটেশ্বরের মিলিটারি গোঁফ ছুঁয়ে বাড়িবাড়ি ছুটে যাচ্ছে। চাঁদ দেখে দক্ষিণের জঙ্গল থেকে শেয়ালেরা 'ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া' বলে হিন্দিতে পরস্পরকে প্রশ্ন করছে। বেলগাছ থেকে একটা প্যাঁচা জানান দিল 'হাম হ্যায়, হাম হ্যায়।'

বটেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের বাঁশিটার দিকে তাকাল। বহুকালের পুরনো মস্ত বাঁশি, গায়ে রুপোর পাত বসানো, তাতে ফুলকারি নকশা। দিনতিনেক আগে সকালবেলায় ঝোলা কাঁধে একটা লোক এসে হাজির। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ঢলঢলে জামা, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। রোগাভোগা চেহারার লোকটা বলল, কোনও রাজবাড়ির কিছু জিনিস সে নিলামে কিনেছে, আর সেগুলোই বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বিক্রি করছে। পুরনো আমলের রুপোর টাকা, জরিবসানো চামড়ার খাপে ছোট্ট ছুরি, অচল পকেটঘড়ি, পেতলের দোয়াতদানি, পাশা খেলার ছক, হাতির দাঁতের পুতুল, এরকম বিস্তর জিনিস ছিল তার সঙ্গে আর ছিল এই বাঁশিটা। বটেশ্বর জীবনে কখনও বাঁশি বাজায়নি, তবে বাজানোর শখটা ছিল। লোকটা বলল, "যেমন তেমন বাঁশি নয় বাবু, রাজবাড়ির

পুরনো কর্মচারীরা বলেছে, এ হল মোহন রায়ের বাঁশি।”

“মোহন রায়টা কে?”

“তা কি আমিই জানি! তবে কেষ্টবিষ্টু কেউ হবেন। বাঁশিতে নাকি ভর হয়।”

লোকটা দুশো টাকা দাম চেয়েছিল। বিস্তর ঝোলাঝুলি করে একশো টাকায় যখন রফা হয়েছে তখন বটেশ্বরের বউ খবর পেয়ে অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে বলল, “টাকা কি খোলামকুচি? একটা বাঁশির দাম একশো টাকা! বলি জীবনে কখনও বাঁশিতে ফুঁ দাওনি, তোমার হঠাৎ কেষ্ঠঠাকুর হওয়ার সাধ হল কেন? ও বাঁশি যদি কেনো তা হলে আমি হয় বাঁশি উনুনে গুঁজে দেব, না হয় তো বাপের বাড়ি চলে যাব।”

ফলে বাঁশিটা তখন কেনা হল না বটে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদে বটেশ্বর যখন বাজারে গেল তখন দেখতে পেল বুড়ো শিবতলায় লোকটা হা-ক্লান্ত হয়ে বসে আছে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সে বাঁশিটা কিনে ফেলল। ফেরার সময় খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে গোয়ালঘরের পাটাতনে বাঁশ-বাখারির ভিতরে গুঁজে রেখে দিয়ে এল।

আশ্চর্যের বিষয়, সেদিন রাতে তার ভাল ঘুম হল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল বাঁশিটা যেন তাকে ডাকছে। নিশির ডাকের মতো, চুম্বকের মতো। কেবলই ভয় হতে লাগল, বাঁশিটা চুরি যাবে না তো!

দ্বিতীয় রাতেও ঠিক তাই হল। নিশুত রাতে বার বার উঠে বাঁশির নীরব আহ্বান শুনতে পেল সে। কিন্তু বউয়ের ভয়ে বেরোতে পারল না।

আজ তার বউ বিকেলে পাড়া-বেড়াতে গেছে। সেই ফাঁকে বাঁশিটি বের করে নিয়ে দিঘির ধারে এসে বসেছে বটেশ্বর। খুব

নিরাপদ জায়গা। কালীদহ দিঘি ভূতের আখড়া বলে সন্ধের পর কেউ এধারে আসে না। উত্তর ধারে বাঁশবনের আড়াল আছে।

বটেশ্বর বাঁশি বাজাতে জানে না বটে, কিন্তু বাঁশিটাকে সে বড় ভালবেসে ফেলেছে। কী মোলায়েম এর গা, কী সুন্দর কারুকাজ। হেসে খেলে একশো দেড়শো বছর বয়স হবে। এমন বাঁশির আওয়াজও মিঠে হওয়ার কথা। কিন্তু হায়, বটেশ্বর বাঁশিতে ফুঁ দিতেও জানে না।

নিজের অপদার্থতার কথা ভেবে তার চোখে জল আসছিল। জীবনে সে কিছুই তেমন পেরে ওঠেনি। ছেলেবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল হাঁদু মল্লিকের মতো বড়লোক হবে। হতে পারল কি? হরিপদ কানুনগোর মতো ফুটফুটে চেহারাও তো ভগবান তাকে দেননি। ব্রজকিশোর দাসের পেল্লায় স্বাস্থ্যের ওপর কি কম লোভ ছিল তার? কিছুদিন ব্যায়াম ট্যায়াম করে শেষে হাল ছাড়তে হয়েছিল তাকে। তারক রায়ের মতো সুরেলা গলা কি তার হতে পারত না? আর কিছু না হোক গোটা মহকুমা যাকে এক ডাকে চেনে সেই শাজাহান, সিরাজদ্দৌলা বা টিপু সুলতানের ভূমিকায় দুনিয়া কাঁপানো অভিনেতা রাজেন হালদারের মতো হতেই বা দোষ কী ছিল? কিংবা লেখাপড়ায় সোনার মেডেল পেয়ে গরিবের ছেলে পাঁচুগোপাল যে ধাঁ করে বিলেত চলে গেল। সেরকমটা কি একেবারেই হতে পারত না তার? পাঁচুগোপাল যে স্কুলে পড়েছে সে-ই নরেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে তো সেও পড়ত। জামা নেই, জুতো নেই, খাবার জুটত না, তবু পাঁচু সোনার মেডেল পেল। আর বটেশ্বর? এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে উঠতে যেন দম বেরিয়ে যেত তার। মনে হত পরের ক্লাসটা কত উঁচুতে রে বাপ! পেটে বিদ্যে নেই, গলায় গান নেই, শরীরে স্বাস্থ্য নেই, মুখে রূপ নেই, বেঁচে থাকাটার ওপরেই ভারী ঘেন্না হয় তার।

কালীদহের ভাঙা পৈঠায় বসে এইসব ভাবতে ভাবতে আর চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বাঁশিটার গায়ে হাত বোলাচ্ছিল। একশো টাকা দিয়ে কিনেছে বটে কিন্তু এ-বাঁশি বাজানোর সাধ্য তার নেই। বাঁশিটাকে আদর করতে করতে সে ফিসফিস করে বলল, আহা, যদি আমি তোকে একটু বাজাতে পারতাম!"

বটেশ্বরকে চমকে দিয়ে ঠিক এই সময়ে কাছের আমগাছ থেকে একটা পাখি পরিষ্কার ইংরিজিতে বলে উঠল, "ডু ইট! ডু ইট! ডু ইট!"

সত্যিই বলল নাকি? না, ও তার শোনার ভুল! পাখি কতরকম ডাক ডাকে। ওরা তো আর ইংরেজি জানে না।

তবু ডাকটা নিয়তির নির্দেশ বলেই কেন যেন মনে হচ্ছিল তার। কে জানে বাপু, দুনিয়ায় কত অশৈলী কাণ্ডই তো ঘটে। তাই বটেশ্বর সাবধানে চারপাশটা একটু দেখে নিল। না, কেউ কোথাও নেই। থাকার কথাও নয়। কেউ দেখে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে। একা-একাও তার লজ্জা করছে। নিজের কাছেও কি মানুষ লজ্জা পায় না? দোনামোনা করে সে বলে উঠল, "চেষ্টা করব?"

অমনি কালীদহের মোটাসোটা পুরনো ব্যাঙগুলোর একটা জলের কাছ থেকে মোটা গলায় বলে উঠল, "লজ্জা কী? লজ্জা কী? লজ্জা কী?"

ফের বটেশ্বর চমকাল। নাঃ, নিয়তি আজ যেন চারদিক থেকে তাকে হুকুম দিচ্ছে। খুবই লাজুক মুখে আড়বাঁশিটা তুলে সে খুব জোরে একটা ফুঁ দিল। বলাই বাহুল্য, কোনও আওয়াজ বেরোল না। শুধু ফস করে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে গেল। বড্ড লজ্জা পেয়ে ক্ষান্ত হল বটেশ্বর।

কাছেই ভাঙা শিবের দেউল। দেওয়াল কেটে একশো অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। সেখান থেকে একটা তক্ষক বলে উঠল, "চেষ্টা করো!

চেষ্টা করো! চেষ্টা করো!"

বটেশ্বর অবাক থেকে অবাকতর হচ্ছে। এসব কি ছদ্মবেশী দৈববাণী নাকি? চতুর্দিকে কি একটা অলৌকিক ষড়যন্ত্র চলছে? বাঁশিওলা বলেছিল বটে যে, বাঁশিতে ভর হয়। তা হলে কি তার মতো আনাড়ির ফুঁয়ে বাঁশি বেজে উঠবে?

একটু ভরসামতো হল বটেশ্বরের। আরও বার কয়েক ফুঁ দিয়ে দেখল সে। না, শুধু ফস ফস করে হাওয়া বেরোল, আওয়াজ হল না। হতাশ হয়ে সে চুপ করে বসে রইল।

বিমর্ষ মনে বাড়ি ফিরে বাঁশিটা গোয়ালঘরে যথাস্থানে রেখে বটেশ্বর যখন ঘরে ঢুকল তখন তার বউ বলল, "ওগো, আজ সন্ধেবেলায় দুটো লোক তোমার খোঁজে এসেছিল।"

"তারা কারা?"

"কে জানে, চেনা লোক নয়। একজন খুব লম্বাচওড়া, আর একজন কেমন যেন শকুন, শকুন চেহারা।"

"কী দরকার তাদের?"

"শকুনের মতো লোকটা জিজ্ঞেস করল একজন বুড়ো মানুষের কাছ থেকে আমরা একটা রুপোবাঁধানো বাঁশি কিনেছি কি না। যদি কিনে থাকি তবে তারা বাঁশিটা ডবল দামে কিনে নেবে। শুনে আমার ভারী মনখারাপ হয়ে গেল। বাঁশিটা তোমাকে কিনতে দিলেই ভাল করতুম। ডবল দাম পাওয়া যেত।"

বটেশ্বরের বুকের ভিতরটা খুব ধুকুর পুকুর করছিল। বলল, "তা তুমি কী বললে?"

"বললুম, একজন বুড়োমানুষ বাঁশি বেচতে এসেছিল বটে, দরদামও হয়েছিল, কিন্তু শেষ অবধি আমরা নিইনি। তখন জিজ্ঞেস করল, বাঁশিটা কে কিনেছে তা আমি জানি কি না। আমি বললাম, অত দাম দিয়ে ও বাঁশি এখানে কে কিনবে। তবে আমি ঠিক জানি

না। দেখলাম বাঁশির জন্য খুব গরজ।”

“এলেবেলে লোক, নাকি পয়সাওয়ালা?”

“না, না, বেশ পয়সাওলা লোক বলেই মনে হল। শকুনির মতো দেখতে লোকটার হাতে কয়েকটা আংটি ছিল, গলায় সোনার চেন, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর পরনে ধাক্কাপেড়ে ধুতি। লোকটার বেশ চোমড়ানো গোঁফ আর বাবরি চুল। তবে চোখ দুটো যেন বাঘের মতো জ্বলজ্বলে, তাকালে ভয়-ভয় করে।”

“আর সঙ্গের লোকটা?”

“সে কথাবার্তা বলেনি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে পালোয়ান টালোয়ান মনে হয়। পাহাড়ের মতো শরীর। এখন মনে হচ্ছে বাঁশিটা তোমাকে কিনতে না দিয়ে ভুলই হয়েছে।”

বটেশ্বর এ-কথার জবাব দিল না। চিন্তিত মুখে সে কুয়োপাড়ে হাত মুখ ধুতে গেল। বাঁশিটার কী এমন মহিমা যে, লোকে ডবল দামে কিনতে চায়! ঘটনাটা বেশ চিন্তায় ফেলে দিল তাকে। তবে এটা বোঝা শক্ত নয় যে, বাঁশিটা খুব সাধারণ বাঁশি হলে লোকে বাড়ি বয়ে খবর করতে আসত না। সুতরাং বটেশ্বরের বুকের ধুকধুকুনিটা কমল না। একটা অজানা আশঙ্কায় তার মনটা কু ডাকতে লাগল।

ময়নাগড়ে নানান মানুষের নানান সমস্যা। যেমন কালীপদ সমাদ্দার। সে হল চিরকেলে ব্যথা-বেদনার রুগি। ব্যথা ছাড়া জীবনে একটা দিনও কাটায়নি সে। একদিন দাঁতব্যথায় কাতরায় তো পরদিন কান কটকটানির চোটে বাপ রে মা রে করে চেঁচায়। পরদিনই হয়তো কানের বদলে হাঁটু কামড়ে ধরে একটা কেঁদো বাঘ যেন হাড়মাস চিবোতে থাকে। দু'দিন পর মাজায় যেন কুড়ুলের কোপ পড়ার মতো ঝলকে ঝলকে ব্যথা শানিয়ে ওঠে। কোমর সারল তো মাথায় যেন কেউটের ছোবলের মতো ব্যথার বিষ তাকে কাহিল করে ফেলে। যেদিন আর কোনও ব্যথা না থাকে সেদিন পেটের মধ্যে পুরনো

আমাশার ব্যথাটা চাগিয়ে উঠে তাকে পাগল করে তোলে। ব্রজ কবরেজ অনেক নিরখ পরখ করে বলেছে, 'আসলে ব্যথা তোমার একটাই, তবে সেটা বানরের মতো এ ডালে ও ডালে লাফিয়ে বেড়ায়। ও ব্যথা যেমন চালাক তেমনি বজ্জাত। হাঁটুর ব্যথার ওষুধ দিলে ও গিয়ে মাজায় ঘাপটি মেরে থাকে। মাজায় ওষুধ পড়লেই লম্ফ দিয়ে দাঁতের গোড়ায় গিয়ে লুকিয়ে থাকে। সেখান থেকে তাড়া খেলে গিয়ে কানের মধ্যে সেঁধোয়। ওর নাগাল পাওয়াই ভার, তাই বাগে আনাও শক্ত।"

ব্যথার ইতিবৃত্ত শুনে হোমিওপ্যাথ নগেন পাল চিন্তিত মুখে বলেছিল, 'ব্যথা তো আমি এক ডোজেই কমিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ওই মাজার ব্যথা তারপর কী মূর্তি ধারণ করবে সেইটেই ভাবনার কথা। নিত্যকালীপিসির পিঠের ব্যথা কমাতে গিয়ে কী হয়েছিল জানো? পিঠের ব্যথা সারতেই তার মাথার গণ্ডগোল দেখা দিল। চেঁচায়, কাঁদে, বিড়বিড় করে। দিলাম মাথার ওষুধ, মাথা ভাল হয়ে গিয়ে পিঠের ব্যথা ফিরে এল। তাই আমি বলি কী, ওই মাজার ব্যথাকে না ঘাঁটানোই ভাল। কাবলিওয়ালাকে তাড়ালে হয়তো কাপালিক এসে থানা গেড়ে বসবে। তাতে লাভ কী?'

ময়নাগড়ের অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার প্রভঞ্জন প্রামাণিক ইঞ্জেকশন ছাড়া কথাই কয় না। যে রুগিই আসুক আর তার যে রোগই হয়ে থাকুক না কেন প্রভঞ্জন আগে তাকে একটা ইঞ্জেকশন ঠুকে দেবেই। রুগিদের উদ্দেশে তার একটাই কথা, ইঞ্জেকশন নাও, সব সেরে যাবে। দেখা যায়, প্রভঞ্জন যেমন ইঞ্জেকশন দিতে ভালবাসে তেমনি অনেক লোক আছে যারা ইঞ্জেকশন নিতেও খুব পছন্দ করে। বুড়ো উকিল তারাপদ সেন তো প্রায়ই সন্ধেবেলা এসে প্রভঞ্জনের ডাক্তারখানায় বসে, আর বলে, 'দাও তো ডাক্তার একটা ইঞ্জেকশন ঠুকে। ওটি না নিলে আজকাল বড় আইঢাই হয়, কেমন ফাঁকা ফাঁকা

লাগে, মনে হয় আজ যেন কী একটা হয়নি।' বিশ্বম্ভর সাঁতরা কোনও শুভ কাজে যাওয়ার আগে প্রভঞ্জনের কাছে একটা ইঞ্জেকশন না নিয়ে যায় না। জরুরি মোকদ্দমা বা শ্বশুরবাড়িতে জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্নে যাওয়ার আগে ইঞ্জেকশন একেবারে বাঁধা।

এই তো সেদিন হাটপুকুরের গজানন বিশ্বাসের মেজো মেয়ে শেফালিকে ভূতে ধরেছিল। খোনা সুরে কথা কয়, এলোচুলে ঘুরে বেড়ায়, দাঁতকপাটি লাগে। ওম বদ্যি কিছু করতে পারল না। তখন ডাকা হল প্রভঞ্জনকে। প্রভঞ্জন গিয়েই ইঞ্জেকশন বের করে ওষুধ ভরে ছুঁচ উঁচিয়ে যেই শেফালির দিকে এগিয়েছে অমনি ভূতটা শেফালিকে ছেড়ে বেরিয়ে এসে হাতজোড় করে বলল, "যাচ্ছি ডাক্তারবাবু, যাচ্ছি। আপনার জ্বালায় কি কোথাও তিষ্ঠোবার উপায় আছে?"

কালীপদকে তিনশো বাহান্ন নম্বর ইঞ্জেকশনটা দিয়ে ঘটনাটা প্রভঞ্জন নিজেই বলেছিল। বলল, "ইঞ্জেকশনে সারে না এমন রোগ দেখিনি বাপু। তোর ব্যথাটা যখন সারছে না তখন ধরে নিতে হবে ওটা তোর আসল ব্যথা নয়, ব্যথার বাতিক। বাতিকও আমি সারাতে পারি বটে, কিন্তু ভয় কী জানিস? ভয় হল, উটের যেমন কুঁজ, গোরুর যেমন গলকম্বল, হাতির যেমন শুঁড়, তোরও তেমনি ওই বাতিক। বাতিক সারালে তুই কি বাঁচবি?"

সুতরাং ব্যথা-বেদনা নিয়েই কালীপদ বেঁচে আছে। গতকাল তার হাঁটুতে ব্যথা ছিল। আজ হাঁটুর ব্যথা নেই, কিন্তু সকাল থেকে দাঁতের কনকনানি শুরু হয়েছে। সন্ধেবেলা সে এই গ্রীষ্মকালে কম্ফর্টারে গাল মাথা জড়িয়ে বসে আছে আর আহা উহু করছে।

এমন সময় দুটো লোক এসে হাজির হল। এলেবেলে লোক নয়, রীতিমতো সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন মাঝবয়সী মানুষ, তার পরনে রেশমি পাঞ্জাবি, ধাক্কাপেড়ে ধুতি। মস্ত গোঁফ এবং বাবরি চুল।



চেহারাটা রোগাটে হলেও বেশ শক্তসমর্থ। দেখে মনে হয় রাজা জমিদারের পরিবারের লোক। সঙ্গে একজন কুস্তিগিরের মতো লোক, যেমন লম্বা তেমন চওড়া।

প্রথমজনই কথা শুরু করল। বেশ গমগমে গলায় বলল, "আমরা একটা জিনিসের সন্ধানে অনেক দূর থেকে এসেছি। একটু সাহায্য করতে পারেন?"

এরকম বড় মাপের একজন মানুষ বাড়িতে আসায় ভারী তটস্থ হয়ে পড়ল কালীপদ। হাতজোড় করে "আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য।" বলে তাদের বৈঠকখানায় বসাল। তারপর হাত কচলে বলল, "বলুন কী করতে পারি।"

"আপনি কেতুগড় রাজবাড়ির নাম শুনেছেন?"

"খুব শুনেছি।"

"আমি ওই পরিবারেরই একজন বংশধর। আমার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।"

"কী সৌভাগ্য! আপনিই কি রাজাবাহাদুর?"

লোকটার দাঁতগুলো বেশ বড় বড়। সেই দাঁত দেখিয়ে একটু হেসে বলল, "না, না, রাজাগজা নই। রাজতন্ত্রই নেই তো রাজা। আমাদের অবস্থাও আগের মতো নেই। কিছুদিন আগে কেতুগড়ের রাজবাড়ি থেকে কিছু জিনিস চুরি যায়। ছিঁচকে চোরেরই কাজ। দামি জিনিসপত্র কিছুই তেমন খোয়া যায়নি। তবু তার মধ্যে দুটো একটা জিনিস পুরনো স্মারক হিসেবে আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। আমরা জিনিসগুলো উদ্ধার করতে চাই।"

কালীপদ ভারী ব্যস্ত হয়ে বলল, "বটেই তো! তা হলে পুলিশের কাছে—"

লোকটা হাত তুলে তাকে থামাল। হাতে হিরের আংটি ঝিলিক দিয়ে উঠল। লোকটা বলল, "পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিন্তু

তাদের তো আঠারো মাসে বছর। চোর ধরতে ধরতে জিনিসগুলো বেহাত হয়ে যাবে। তাই আমরা নিজেরাও একটু চেষ্টা করছি। যে লোকটা চুরি করেছিল সে বুড়োমতো, গোঁফদাড়ি আছে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। আমরা খবর পেয়েছি যে এই ময়নাগড়েই কিছু জিনিস বিক্রি করে গেছে।"

লোকটার বর্ণনা শুনে কালীপদর মুখ শুকিয়ে গেল। কেননা কয়েকদিন আগে যখন তার কোমরে ব্যথা হয়েছিল তখন ওই লোকটা তার কাছে এসেছিল বটে, ঝোলার মধ্যে অনেক পুরনো আমলের জিনিস ছিল। তা থেকে একটা ভারী সুন্দর জাপানি পুতুল মেয়ের জন্য কিনেছিল বটে কালীপদ। লোকটা পঞ্চাশ টাকা দাম হেঁকেছিল, শেষে কুড়ি টাকায় দিয়ে দেয়।

সে যখন এসব কথা ভাবছে তখন নরেন্দ্রনারায়ণ তার বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। একটু হেসে বলল, "জিনিসগুলো আমরা সবই ডবল দামে কিনে নেব। কিন্তু যে জিনিসটা আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরি তা হল একটা বাঁশি। বহু পুরনো রুপোয় বাঁধানো বাঁশি।"

কালীপদ মাথা নেড়ে বলল, "বাঁশির কথা জানি না। তবে আমি একটা জাপানি পুতুল তার কাছ থেকে কিনেছিলাম বটে।"

"বাঁশিটা কে কিনেছে জানেন?"

"না।"

"এই ময়নাগড়েরই কেউ কিনেছে বলে আমাদের চর খবর দিয়েছে।"

"আমি বাঁশি কিনিনি রাজামশাই। চুরির জিনিস জানলে পুতুলটাও কিনতাম না, লোকটা বলেছিল কোনও রাজবাড়ি থেকে নিলামে কিনেছে।"

নরেন্দ্রনারায়ণ ভ্রু কুঁচকে বলল, "আমাকে রাজামশাই বলে লজ্জা

দেবেন না। রাজত্ব থাকলে অবশ্য আজ আমার রাজা হওয়ারই কথা, কিন্তু তা যখন নেই তখন আমি আর রাজাগজা নই, সাধারণ মানুষ।"

লোকটা যাই বলুক এর গা থেকে কালীপদ রাজা-রাজা গন্ধ পাচ্ছিল। ঘরে রাজাগজা আসাতেই কি না কে জানে তার দাঁতের ব্যথাটাও উবে গেছে, সে গদগদ হয়ে বলল, "আহা গায়ে রাজরক্তটা তো আছে। রাজত্ব না থাকলেও কি রাজার মহিমা কমে যায় নাকি? মরা হাতি লাখ টাকা।"

নরেন্দ্রনারায়ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "শরীরে রাজার রক্তটাই যা আছে। যাকগে, জাপানি পুতুলটা আপনি বরং রেখেই দিন। ওটা না হলেও আমাদের চলবে। কিন্তু বাঁশিটা আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। আপনি কি এ-ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে পারেন?"

কালীপদ হাত কচলে বলল, "আজ্ঞে, আপনি যখন আদেশ করলেন তখন অবশ্যই খোঁজ করে দেখব। ও তো কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।"

"আমরা বাঁশির জন্য পুরস্কার দিতেও রাজি আছি আর ডবল দাম তো দেবই।"

কালীপদর চোখ চকচক করে উঠল, বলল, "যে আজ্ঞে।"

ময়নাগড়ের সবচেয়ে বড়লোক হল হাঁদু মল্লিক। তার মস্ত সুদের কারবার আর তেলের ব্যবসা। লাখো লাখো টাকা। তবে কিনা হাঁদু মল্লিককে দেখে সেটা বুঝবার উপায় নেই। সে হেঁটো ধুতি পরে, গায়ে মোটা কাপড়ের একখানা বিবর্ণ জামা। পায়ে শস্তা রবারের চটি, বেঁটেখাটো হাঁদু মল্লিক রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে বড়মানুষ বলে চেনা দায়।

রোজকার মতোই হাঁদু সন্ধেবেলায় তার গদিতে বসে সারাদিনের হিসেব নিকেশ জাবদা খাতায় টুকে রাখছিল। এ সময়টায় তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তবে আজ সে কিছু আনমনা। হয়েছে কি, দিনদুই আগে দুপুরের দিকে দাড়িগোঁফওয়ালা একটা লুঙ্গি পরা লোক ঝোলাকাঁধে এসে হাজির। বলল, কোন রাজবাড়ি থেকে নিলামে কিছু জিনিস কিনে এনেছে। রাজবাড়ির জিনিস শুনে হাঁদুর একটু কৌতূহল হল। থলি থেকে বিস্তর অকাজের জিনিস বের করে দেখাল লোকটা। তার মধ্যে গোটা কুড়ি পঁচিশ পুরনো রুপোর টাকাও ছিল। রুপো দামি জিনিস বলে হাঁদু দরদাম করে গোটা দুই কিনে ফেলেছিল ত্রিশ টাকায়। জালি জিনিস হতে পারে ভেবে বেশি কিনতে সাহস হয়নি। কিন্তু গতকাল বিধু স্যাঁকরা এসে টাকাদুটো দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, "করেছেন কী হাঁদুবাবু, এ তো রুপোর টাকা নয়! রুপোর মোড়কে এ যে খাঁটি মোহর! ওজনটা দেখছেন না! রুপোর কি এত ওজন হয়?" বলে বিধু একপাশ থেকে একটু ছিলকে কেটে দেখাল, ভিতরে সোনা চকচক করছে। সেই থেকে মনটা বড় হায়-হায় করছে হাঁদুর। পঁচিশটা টাকা যদি সাহস করে কিনে ফেলত তা হলে কী ভালটাই না হত। এখন তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। এত দুঃখ হচ্ছে যে, হাঁদু ভাল করে খেতে বা ঘুমোতে পারছে না, পেটে বায়ু হয়ে যাচ্ছে, দুঃস্বপ্ন দেখছে। লোকটাকে খুঁজে আনতে সে তার পাইক পাঠিয়েছিল। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি তাকে।

গতকাল থেকে তাই মনটা বড় উচাটন। আজ হিসেব করতে বসেও মাথাটা গণ্ডগোল করছে। আজ হয়েছে কি, দু' হাজার সাতশো নয়ের নয়, আট হাজার পাঁচশো সাতাশির সাত, দশ হাজার নশো আঠাশের আট, পাঁচশো ছাব্বিশের ছয়, সাত হাজার তিনশো বত্রিশের দুই আর দশ হাজার দুশো চুয়াল্লিশের চার, যোগ করে হবে

ছত্রিশ। ছত্রিশের ছয় নামবে, হাতে থাকবে তিন। ঠিক এই খানটাতেই তার চল্লিশ বছরের হিসেব করা পাকা মাথায় কেমন যেন হরিবোল হয়ে গেল। কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না ছত্রিশের কত নামবে আর কত হাতে থাকবে। ছয় নেমে হাতে থাকবে তিন, নাকি তিন নেমে হাতে থাকবে ছয়! কোনটা নামে, কোনটা হাতে থাকে তা নিয়ে এমন গণ্ডগোলে সে কখনও পড়েনি। অগত্যা সে বিশু পালকে লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলল, "ওহে বিশু, ছত্রিশের কত নামবে আর কত হাতে থাকবে বলো তো!"

বিশু সেই বিকেল থেকে দশটা টাকা হাওলাত চাইতে এসে বসে আছে। হাঁদু মল্লিক রাজি হচ্ছে না। বলেছে, 'আজ তিন মাস সাড়ে তিনশো টাকা ধার নিয়ে বসে আছ, একটি পয়সা ছোঁয়াওনি। বাহান্ন টাকা সুদ সমেত চারশ দু টাকা আগে শোধ দাও, তারপর নতুন ধারের কথা।'

বিশু তবু আশায় আশায় বসে আছে।

ধার চাইতে সে আর যাবেই বা কোথায়। সব জায়গাতেই তার দেনা। ময়নাগড়ের সবাই তার পাওনাদার।

মেজাজটা আজ তার বড়ই খিচড়ে আছে। বিকেলেই দেখে এসেছে, সন্ধ্যা বাজারে মাছওয়ালা সনাতন কাদা চিংড়ির ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে। কাদা চিংড়ি সে বড্ড ভালবাসে। চচ্চড়ি রেঁধে খেতে যেন অমৃত। দশটা টাকা হাওলাত পেলে হয়ে যেত। এতক্ষণ আর সে মাছ পড়ে নেই। হাঁদুর প্রশ্ন শুনে তাই সে খিঁচিয়ে উঠে বলল, "ছত্রিশের কত নামে আর কত হাতে থাকে তার আমি কী জানি! দশটা টাকা যখন ধার চেয়েছিলুম তখন খেয়াল ছিল না যে, এই শর্মাকেও একসময়ে দরকার হবে! দশটা টাকা ফেললেও না হয় চেষ্টা করে দেখতুম। তা যখন দাওনি তখন নিজের হিসেব তুমি নিজেই বোঝো।"



একধারে রাখাল মোদক চুপচাপ বসে ছিল। সে হল ময়নাগড়ের সবচেয়ে বোকা লোক। রোজ সন্ধেবেলায় সে হাঁদুর গদিতে টাকার গন্ধ শুঁকতে আসে। টাকাপয়সার গন্ধ মাখানো বাতাসে শ্বাস নিলে তার ভারী আরাম বোধ হয়। হাঁদু মল্লিকের গদিতে সাতখানা সিন্দুকে টাকাপয়সা আর সোনাদানা গচ্ছিত। বাতাসে ম' ম' করছে টাকার গন্ধ। সকলে গন্ধটা পায় না বটে, কিন্তু রাখাল মোদক পায়। আর সেই গন্ধে তার একটু নেশার মতোও হয়। ঘরে বাইরে সবাই রাখালকে বোকা বলেই জানে, রাখালও লোকের মুখে শুনে শুনে জেনে গেছে যে, সে খুব বোকা। নিজেকে বোকা বলে জানার পর থেকে সে খুব হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। লোকের সঙ্গে কথা কইবার আগেই সে বলে নেয়, "ভাই, আমি বড্ড বোকা, আমাকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে।" বাজারে গিয়ে দোকানিদের সে বলে "আমি বড্ড বোকা তো, তোমরা কিন্তু আমাকে আবার ঠকিয়ে দিও না," এই তো কয়েকদিন আগে তার বাড়িতে মাঝরাতে চোর ঢুকেছিল। রাখাল ঘুম ভেঙে চোরকে দেখে বলে উঠল, "আহা, করো কী, করো কী, আমি যে বড্ড বোকা মানুষ। আমার বাড়িতে কি চুরি করতে আছে?" চোরটা খুব বিরক্ত হয়ে বলল, "কে বলল আপনি বোকা? আপনাকে তো বেশ সেয়ানা লোক বলেই মনে হচ্ছে। চোরকে ভড়কে দিতে চান বুঝি?" রাখাল বেশ বুক ফুলিয়ে বলল, "মোটেই সেয়ানা নই হে, ময়নাগড় ঢুঁড়লেও তুমি আমার মতো বোকা লোক পাবে না," চোরটা একটা ফুৎকারে তার দাবি নস্যাৎ করে বলল, "ওই আনন্দেই থাকুন। পদ্মলোচন আঢ্যকে চেনেন? যে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বটপাতা দিয়ে সাজা পান খেয়ে তারিফ করেছিল? আর হরেন পাড়ুই কি কম যায় নাকি? পাশের নন্দরামের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, হরেন পাড়ুই গিয়ে সর্দারের হাতে পায়ে ধরে বলে কি, আমার বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো না

দিলেই যে নয়। নন্দরামের বাড়িতে ডাকাতি হল আর আমার বাড়িতে যদি না হয় তা হলে কি শ্বশুরবাড়িতে আমার প্রেস্টিজ থাকবে? তা আপনি কি তাদের চেয়ে বেশি বোকা? বোকা হলেও আপনি মোটেই এক নম্বর নন, তিন চার বা পাঁচ নম্বর।" রাখাল এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক ওই সময়ে তার বউ উঠে ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করায় চোরটা পালিয়ে যায়। উপরন্তু মাঝরাতে চোরের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে বউয়ের ঘুম ভাঙানোয় বউ রেগে গিয়ে রাখালকে উস্তম কুস্তম বকাঝকা করে। আজকাল তাই নিজের বোকামি সম্পর্কে রাখালের একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। হয়তো সে নিরেট বোকা নয়, তার বোকামিতে হয়তো ফুটোফাটা আছে। চোরটা কত বাড়িতে ঘোরে, কত অভিজ্ঞতা!

টাকার গন্ধে রাখালের চোখ আরামে বুজে আসছিল, এমন সময় ছত্রিশ নিয়ে গণ্ডগোলটা তার কানে গেল। সে খুব ঠাহর করে সমস্যাটা শুনে নিয়ে হাঁদুকে বলল, "তোমার ছত্রিশ অবধি যাওয়ার দরকার কী? একটু কমিয়ে, কাটছাঁট করে তেত্রিশে নামিয়ে আনো। দেখবে ল্যাটা চুকে যাবে। তেত্রিশের যা নামবে তাই হাতে থাকবে। বুঝেছ? যা খুশি নামাও, ওঠাও, কোনও অসুবিধে নেই।"

হাঁদু চটে উঠে বলল, "ওই জন্যই তো তোমার কিছু হল না। শুয়ে, বসে আর ঝিমিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলে। যত সব মুখ্যু এসে জোটে আমার কপালে। একটা সোজা অঙ্কের সোজা নিয়ম, তাই পেরে উঠছ না! ছত্রিশের কত নামে আর কত হাতে থাকে এ তো বাচ্চা ছেলেরও জানার কথা।"

এমন সময়ে কাছেপিঠে যেন বাজ পড়ার শব্দ হল। বাজ নয় অবশ্য, একটা বাজখাঁই গলা বলে উঠল, 'ছত্রিশের ছয় নামবে, হাতে থাকবে তিন।"

দৈববাণী হল কি না বুঝতে না পেরে হাঁদু ওপর দিকে চেয়ে

দেখল। দৈববাণী অবশ্য হাঁদুর জীবনে নতুন কিছু নয়। কোনও বেঁয়াড়া, মতলববাজ খদ্দের এলে তার কানে কানে ফিসফিস করে দৈববাণী হয়। "দিও না হে একে ধারকর্জ দিও না।" কিন্তু এরকম বজ্রপাতের মতো বিকট দৈববাণী সে আর শোনেনি।

দৈববাণীর উদ্দেশে হাতজোড় করে একটা নমো ঠুকে হাঁদু ছত্রিশের ছয় নামাতে যাচ্ছিল, এমন সময় সেই দৈববাণীর গলাটাই দরজার কাছে থেকে এক পরদা নীচে নেমে বলল, "ভিতরে আসতে পারি?"

হাঁদু দেখল দরজার বাইরে দুটো লোক দাঁড়িয়ে। সামনের লোকটার পোশাকআশাক, গলার চেন, হাতে হিরের আংটি লম্ফের আলোতেও চোখে পড়ার মতো। সাধারণ খদ্দের নয়।

হাঁদু শশব্যস্তে বলল, "আসুন, আসুন। আস্তাজ্ঞে হোকে, বস্তাজ্ঞে হোক।"

রোগাটে, লম্বাটে, ফর্সাটে, গুঁফো এবং বাবরিবান লোকটাকে দেখে বিশু আর রাখালও নড়েচড়ে বসল।

হাঁদু হাতজোড় করে বলে উঠল, "আজ্ঞা করুন।'

লোকটা চারদিকটা একবার উদাস চোখে দেখে নিয়ে তার রাজকীয় গলায় বলল, "আমি কেতুগড় রাজবাড়ি থেকে আসছি। আমার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ। আমি রাজা দিগিন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র।"

হাঁদু বিগলিত হয়ে বলল, "কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! এ যে ভাঙা ঘরে চাঁদের উদয়! এ যে ইঁদুরের গর্তে বেড়াল! এ যে এঁদো পুকুরে গাদাবোট! আরও কী যেন... ওহে বিশু, বলো না!"

বিশু কিছু বলার আগেই রাখাল বিশ্বাস বিগলিত হয়ে বলে ফেলল, "এ যেন পায়েসের বাটিতে পরমান্ন! এ যেন গদাহস্তে ভীমের প্রবেশ..."

বিশু তাড়াতাড়ি উঠে পায়ের ধুলো নিয়ে একগাল হেসে বলল, "তাই বলুন। দেখেই কেমন চেনা-চেনা লাগছিল।"

নরেন্দ্রনারায়ণ বরাভয়ের মুদ্রায় সবাইকে শান্ত করে তেমনি গম্ভীর গলায় বলল, "বিশেষ প্রয়োজনেই আমার ময়নাগড়ে আসা। রাজবাড়ি থেকে কিছু জিনিস চুরি গেছে। খবর পাওয়া গেছে দাড়ি গোঁফওয়ালা একজন মধ্যবয়সী লোক জিনিসগুলো এই গাঁয়ে এবং আশেপাশে বিক্রি করে গেছে। আমরা সেইসব জিনিসের সন্ধানেই এসেছি। আপনারা যদি কেউ কিছু কিনে থাকেন তা হলে আমরা সেগুলো ডবল দামে কিনে নেব। তবে সবচেয়ে গুরুতর জিনিসটি হচ্ছে একটা রুপোয় বাঁধানো বাঁশি। অন্য জিনিস পাওয়া না গেলেও বাঁশিটা আমাদের খুবই দরকার। ওটার জন্য হাজার টাকা পুরস্কার।

হাঁদুর বুক ধকধক করছে। দু-দুটো মোহর মাত্র ত্রিশ টাকায় কিনেছে সে। ডবল দাম পেলেও তো মোটে ষাট টাকা। মোহরের দাম যে অনেক বেশি। সে গলা খাঁকারি দিয়ে বিগলিত মুখে বলল, "এসেছিল বটে একটা পাগলা মতো লোক। আমি চোরাই জিনিস দেখেই বুঝতে পারি কিনা। তাই তাকে বেশি পাত্তা দিইনি। চোর চোট্টাদের সঙ্গে কারবার করে কি মরব রাজামশাই?"

বিশু পাল দুঃখের গলায় বলল, "আহা, ডবল দামের কথা আগে জানলে কিছু জিনিস কিনে রাখতাম।"

রাখাল বিশ্বাসও বলল, 'ওঃ বড্ড ভুল হয়ে গেছে। লোকটা আমার বাড়িতেও এসেছিল বটে। তা রাজামশাই বাঁশিটা কি রুপোয় বাঁধানো না হলেও চলবে? আমার সেজো ছেলে গুলু কয়েকদিন হল একটা বাঁশি হাতে ঘোরাঘুরি করছে দেখছি।"

নরেন্দ্রনারায়ণ দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, "না, আমাদেরটা রুপোয় বাঁধানো এবং অনেক দিনের পুরনো। ও বাঁশি যার-তার হাতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক।"

ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে উঠতে সত্যগোপালের লেগেছিল দু'বছর। সিক্স থেকে সেভেনে উঠতে পাক্কা তিন বছর। সেভেন থেকে এইটে উঠতে আরও তিন। প্রতি ক্লাসে উঠেই মনে হত, পরের ক্লাসটা কত উঁচুতে রে বাপ! তবু সে হাল ছাড়েনি। বিস্তর মেহনতে হাঁচোড়পাঁচোড় করে সে একদিন ক্লাস টেনেরও চৌকাঠ ধরে ফেলল। হেডস্যার পান্নালালবাবু পর্যন্ত অবাক হয়ে বলে ফেললেন, "সুয্যি কি পশ্চিমে উঠল নাকি রে সতু, তুইও ক্লাস টেন-এ উঠে পড়লি! বাঃ বাঃ, বড় খুশি হলুম। আর বছরদশেক আমার চাকরি আছে, তার মধ্যেই মাধ্যমিকের বেড়াটা ডিঙিয়ে যা তো বাবা!"

তা হেডস্যারের স্বপ্ন সার্থক করেছিল সত্যগোপাল। দশ বছর নয়, সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে মাত্র চার বছরের চেষ্টায় মাধ্যমিকও পাশ করে ফেলল।

লোককে অবাক করে দেওয়ায় সত্যগোপালের জুড়ি নেই। মাধ্যমিক পাশ করে সে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে সমাজসেবায় নেমে পড়ল। সবাই জানে যে, সমাজসেবা মানে ভেরেণ্ডা ভাজা। সুতরাং সবাই ধরে নিয়েছিল সত্যগোপালের কিছু হবে না। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সবাইকে ফের অবাকই করে দিয়ে সে গোটা তল্লাটের একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠল। শুধু তাই নয়, এলাকার যত স্কুল কলেজ আছে সে সবকটারই গভর্নিং বডির মেম্বার কিংবা প্রেসিডেন্ট, সব কটা ক্লাবের সে চেয়ারম্যান কিংবা সেক্রেটারি, পঞ্চায়েতের চাঁই, গরিব গুর্বোর নেতা। তল্লাটে যত সভা সমিতি হয় সব জায়গায় তার ডাক পড়ে। হয় সভাপতি, নয় প্রধান অতিথি, কিংবা বিশেষ অতিথি। যে স্কুলে সে পড়ত সেই স্কুলের চেয়ারম্যান হওয়ার পর পান্নাবাবু তো হাঁ। সে এমন হাঁ যে কিছুতেই বন্ধ হয় না। শেষে প্রভঞ্জন ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশনের ছুঁচ উঁচিয়ে ধরার পর সেই হাঁ বন্ধ হল।

পান্নালালবাবুকে সান্ত্বনা দিতে এসে মনোরঞ্জন কম্পাউন্ডার বলল, "ও হে পান্নালাল, এ হল ভাগ্যের খেলা। ভাগ্য জিনিসটা কেমন জানো? সোঁদরবনের বাঘ। কোথায় যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে টেরটিও পাবে না। হঠাৎ ঘাড়ে এসে লাফিয়ে পড়ে টুঁটি কামড়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে গিয়ে সাকসেসের চূড়ায় পৌঁছে দিয়ে বসে বসে কলসা নাড়বে। বুঝলে!"

পান্নালালাবাবু বুঝলেন কি না বোঝা গেল না। তবে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। ছাত্রের কৃতিত্ব দেখে তিনি বিশেষ পুলকিত হয়েছেন বলে মনে হল না।

যাই হোক, সত্যগোপাল এখন একজন ভারী ব্যস্ত মানুষ। এখানে উদ্বোধন, সেখানে বৃক্ষরোপণ, কোথাও মূর্তি উন্মোচন, তারপর রক্তদান শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান— সত্যগোপালের কি নাওয়া-খাওয়ার সময় আছে। সভা-সমিতির ছাড়া সে থাকতেও পারে না। তার ভারী আইঢাই হয়।

আজ ময়নাগড়ে বামাসুন্দরী কলেজে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা আলোচনা সভা ছিল। সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে সত্যগোপাল বলল, "আমাদের চারদিকে তো বিজ্ঞান ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। চারদিকে যেন বিজ্ঞানের ঢেউ খেলছে। এই যে হাতে হাতঘড়ি চলছে, বিজ্ঞান। ওই যে মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, বিজ্ঞান। ওই যে পকেটের ডটপেনটা, বিজ্ঞান। এই যে ধুতি-জামা পরে আছি, বিজ্ঞান, মোটরগাড়ি চলছে, রেলগাড়ি ছুটছে, এরোপ্লেন উড়ছে, সব বিজ্ঞান, সব বিজ্ঞান। এই যে মাইকে কথা বলছি এটা অবধি বিজ্ঞান। কিছুদিন আগে শহরে গিয়ে দেখে এলাম, সেখানে বিজ্ঞানের একেবারে মোচ্ছব লেগে গেছে। সর্বত্র কেবল কম্পাউন্ডার আর কম্পাউন্ডার। অফিসে কম্পাউন্ডার, ব্যাঙ্কে

কম্পাউন্ডার, ডাকঘরে কম্পাউন্ডার, হাসপাতালে কম্পাউন্ডার। শোনা যাচ্ছে, এবার থেকে কম্পাউন্ডাররাই সব কিছু করবে! চাষবাস, চিকিৎসা, হিসেবনিকেশ, চিঠিপত্র লেখা, সবই নাকি করবে কম্পাউন্ডার। এমনকী তারা ছবি আঁকবে, কবিতা লিখবে, কলকারখানা চালাবে। মানুষ গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে শুধু।"

শ্রোতাদের মধ্যে মনোরঞ্জন কম্পাউন্ডার ছিল। শ্রোতারা খুব হাসাহাসি করছিল বটে, কিন্তু সে চিন্তিত মুখে পাশে বসা গিরিন খাসনবিশকে ফিসফিস করে বলল, "কম্পাউন্ডারদের ঘাড়ে এত কাজ চাপিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে ভায়া? এই বুড়ো বয়সে আমি কি অত কাজ পেরে উঠব? এ তো খুব চিন্তার কথা হে।"

গিরিন খাসনবিশের ওষুধের দোকান। সে চাপা গলায় বলল, "ভাবছেন কেন? এ তো দেখছি কম্পাউন্ডারদের কপাল খুলে গেল! যাকে বলা যায় কম্পাউন্ডারদের স্বর্ণযুগ! পেটেন্ট ওষুধের দাপটে কম্পাউন্ডারদের চাকরি যাওয়াতেই বোধহয় সরকার বাহাদুর নড়েচড়ে বসেছে। এতদিনে তাদের হিল্লে হল।"

"তা বলে ছবি আঁকা! কবিতা লেখা! ওসব কি পেরে উঠব?"

"চেষ্টা করলে লোকে কি না পারে বলুন!"

সত্যগোপাল হাসি-হাসি মুখে বলল, "বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় অবদান হল ওই কম্পাউন্ডার।"

পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সচ্চিদানন্দবাবু পাশ থেকে সসম্ভ্রমে চাপা গলায় বললেন, "ওটাকে কেউ কেউ কম্পিউটারও বলে থাকে।"

সত্যগোপাল একটু অবাক হয়ে বলে, "বলে নাকি?"

কলেজের ফিজিক্স ল্যাবরেটারির জন্য দু'লাখ টাকার একটা সরকারি অনুদান কিছুদিন আগে এই সত্যগোপালই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। তা ছাড়া সচ্চিদানন্দবাবুর সেজো মেয়েটার বিয়ের সম্বন্ধও হচ্ছে আবার সত্যগোপালের শালার সঙ্গে। তাই সচ্চিদানন্দবাবু খুবই

বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "বললেও হয়। কম্পাউন্ডারও যে চলে না তা নয়, তবে কম্পিউটার কথাটারই চল একটু বেশি আর কী।"

প্রবল হাততালির শব্দে অবশ্য সচ্চিদানন্দবাবুর কথা শোনা গেল না।

হাতজোড় করে সত্যগোপাল সমবেত শ্রোতার হাততালি হাসি-হাসি মুখ করে গ্রহণ করল। সে যখনই যেখানে বক্তৃতা করে সেখানেই হাততালির একেবারে বন্যা বয়ে যায়। অবশ্য একথাও ঠিক যে, সব হাততালি সবসময়ে জায়গামতো পড়ে না, উলটোপালটা জায়গাতেও পড়ে। যেখানে পড়ার কথা নয়, সেখানেও। এই তো সেদিন গোবিন্দপুরের বৃক্ষরোপণ উৎসবে গিয়ে বক্তৃতায় তাড়াহুড়োয় বৃক্ষকে বিক্ষ বলে ফেলেছিল বলে খুব হাততালি পড়ল। তারপর গয়েশবাবুর শোকসভাটায় হল কী, তিরোধান কথাটা ভুল করে অন্তর্ধান বলে ফেলেছিল সত্যগোপাল। হাততালি আর থামতে চায় না। তা হোক, উলটোপালটা পড়লেও ওই হাততালিই সত্যগোপালকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওই হাততালিই তাকে চাঙ্গা রাখে।

হাততালি তখনও থামেনি, সত্যগোপালের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্যাংলা এসে তার কানে কানে বলল, "ওদিকে যে পালঘাটে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভার সময় পার হয়ে যাচ্ছে দাদা। দেখে এলাম সভাপতির মালা শুকিয়ে গেছে, প্রধান অতিথি বুড়ো নিবারণবাবু টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে কাদা, তাঁর নাক ডাকছে। আরও ভয়ের কথা হল, সভার মাঠেই বাজারের ষাঁড় বাবুরাম রাতে এসে শোয়। সে এসে পড়লে সভা ভেঙে যাবে।"

সত্যগোপাল "তাই তো!" বলে তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়ল।

সভায় পৌঁছে দেখা গেল, মহিলারা রান্না চাপাতে বাড়ি ফিরে গেছে, ফাঁকা জায়গায় বাচ্চারা হইহই করে খেলছে, দু-চারজন লোক

এধারে ওধারে বসে গুলতানি করছে। কর্মকর্তারা অবশ্য সত্যগোপালকে খুব খাতির করে নিয়ে মঞ্চে তুলে দিল। সমিতির সম্পাদক বলল, "একটু তাড়াতাড়ি করবেন সত্যবাবু। ওই বাবুরাম ষাঁড়টা বড় বজ্জাত। যেমন গোঁ, তেমনি তেজ। তার আসার সময়ও হয়েছে কিনা।"

মৎস্যজীবীদের সভায় মাছ নিয়ে অনেক কথাই বলার ছিল সত্যগোপালের। যেমন, ভগবান একবার মৎস্য অবতার হয়ে এসে পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একটা কোটেশনও ঠিক করা ছিল, মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে, এখন সুখেতে তারা জলক্রীড়া করে। তারপর আরও কোটেশন, মৎস্য মারিব, খাইব সুখে এবং মাছের মায়ের পুত্রশোক, এবং মাছের তেলে মাছভাজা। তা ছাড়া না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে এবং কৈ মাছ ভাজা খেতে শৈল গেছে ভুলে—এ দুটো কোটেশনও জুতসই জায়গায় লাগানোর মতলব ছিল তার। কিন্তু সবে "ভাই ও বন্ধুগণ" বলে বক্তৃতা শুরু করতেই কে বা কারা যেন বাঁ ধার থেকে চেঁচিয়ে উঠল। "ওই যে, বাবুরাম আসছে!"

সত্যগোপাল যে বাবুরামকে যমের মতো ডরায় তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। ক্লাস এইটে পড়ার সময় সে একদিন ইস্কুল থেকে বন্ধুদের সঙ্গে ফেরার পথে কলা খেয়ে কলার খোসাটা বাবুরামের গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিল। বাবুরাম তাতে কিছু মনে করেনি, খোসাটা অবহেলার সঙ্গে খেয়ে নিয়ে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। কিন্তু বচা বলল, "এ তুই কী করলি সতু? বাবুরাম কে জানিস! সাক্ষাৎ শিবের চেলা। সবাই বাবুরামকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। এঁটো কলার খোসা ছুঁড়ে মারলি, তোর পাপ হবে না?!!"

সত্যগোপাল উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "তা হলে কী করব?"

"যা, ওকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আয়।"

কাজটা সহজ নয়। বুকের পাটা দরকার। কিন্তু সামনেই অ্যানুয়েল পরীক্ষা, এ সময়ে ভগবান পাপ দিয়ে ফেললে যে, পরীক্ষায় ডাব্বা মারতে হবে সেটা চিন্তা করেই সত্যগোপাল মরিয়া হয়ে সন্তর্পণে গিয়ে কী করে বাবুরামের সামনের দুটো পায়ের খুর ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়েই দৌড়ে পালিয়ে এল।

বচা বলল, "দূর! তুই তো ওর হাতে প্রণাম করলি। হাতে প্রণাম করলে কি পাপ কাটে?"

"যাঃ, ওটা হাত কেন হবে? গোরুর তো চারটেই পা।"

"তোকে বলেছে! পা বলে মনে হলেও বাবুরামের সামনের পা দুটো মোটেই পা নয়, হাত। পিছনের পা দুটোই আসল পা।"

এ কথায় একটু বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল সত্যগোপাল। কে জানে বাবা, হতেও পারে। বুক বেঁধে সুতরাং সে দ্বিতীয়বার বাবুরামের দিকে এগিয়ে গেল। এবং খুব দুঃসাহসের সঙ্গে পিছনের পা দুটোর খুরে হাত দিল।

কলার খোসা ছোঁড়া এবং প্রথমবার পায়ের ধুলো নেওয়া পর্যন্ত সহ্য করেছে বাবুরাম। কিছু বলেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার তার পায়ে হাত দেওয়ায় বাবুরাম অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তেড়ে ফুঁড়ে উঠে এমন তাড়া লাগাল সত্যগোপালকে যে আর কহতব্য নয়। সত্যগোপাল শেষ অবধি পালঘাটের খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচায়। সত্যগোপালের ধারণা, বাবুরাম আজও ঘটনাটা ভোলেনি। কালেভদ্রে তাকে দেখলে বাবুরাম দূর থেকেও তার দিকে আড়ে আড়ে চায় আর ফোঁস ফোঁস করে।

সুতরাং বাবুরাম আসছে শুনে যদি সত্যগোপাল মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়িমরি দৌড় লাগায় তাতে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। এই দৌড়টা অতি ছোঁয়াচে জিনিস। সত্যগোপালকে দৌড়োতে দেখে বুড়ো নিবারণবাবুও মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়

লাগালেন। পিছনে প্যাংলাও।

ইস্কুলে লেখাপড়ায় ডাব্বা মারলেও স্কুলের স্পোর্টসে বরাবর সত্য ফার্স্ট সেকেন্ড হয়ে প্রাইজ পেয়েছে। দৌড়টা তার ভালই আসে। জেলেপাড়ার রাস্তা ধরে সে দৌড়োচ্ছিলও ভালই। কিন্তু দেখা গেল আশি বছরের নিবারণবাবুও কম যান না। তিনি প্যাংলাকে ছাড়িয়ে সত্যগোপালকে প্রায় ধরে ফেললেন। ছুটতে ছুটতেই বললেন, "হুঁ হুঁ বাবা, বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখেছ, পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।"

অবাক সত্যগোপাল বলে, "তাই দেখছি! রোজ সকালে উঠে দৌড় প্র্যাকটিস করেন নাকি?"

"পাগল হয়েছ? ওসব আমার পোষায় না। তবে আমার একটা কেলে গোরু আছে। সেটা ভয়ানক পাজি। রোজই খোঁটা উপড়ে পালায়। সেটাকে ঘরে আনতে রোজ বিস্তর দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। আর এই করতে গিয়ে আমার হাঁটুর বাত, মাজার ব্যথা, অনিদ্রা সব উধাও হয়েছে। আজকাল খুব খিদে হয়, ঘুমটাও হচ্ছে পাথরের মতো। সব জিনিসের ভাল আর মন্দ দুটোই আছে, বুঝলে ভায়া? এখন তো মনে হয়, শূন্য গোয়ালের চেয়ে দুষ্টু গোরুই ভাল।"

সত্যগোপাল হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "বাবুরাম কি এখনও তেড়ে আসছে?"

নিবারণবাবু অবাক হয়ে বললেন, "বাবুরাম। কোথায় বাবুরাম?"

"এই যে কে বলল, বাবুরাম আসছে!"

"দূর দূর! তুমিও যেমন! বাবুরাম আসবে কি, আজ জামতলায় নবীন পালের বাড়িতে মদনমোহনের কাঁঠালভোগ। রাজ্যের কাঁঠাল এসেছে ভোগে। বাবুরাম বিকেল থেকেই সেখানে থানা গেড়েছে। যা কাঁঠাল সেঁটেছে তার আর নড়ার সাধ্যি নেই।"

"তা হলে আপনি ছুটছেন কেন?"

"আহা, আমি তো তোমার দেখাদেখি ছুটছি। তোমাকে অমন আচমকা ছুটতে দেখে ভাবলাম, সত্যগোপাল যখন ছুটছে তখন নিশ্চয়ই কোনও বিপত্তি ঘটেছে।"

সত্যগোপাল দাঁড়িয়ে খানিক দম নিল। ছিঃ ছিঃ, এখন ভারী লজ্জা করছে তার। পাবলিকের সামনে ওরকম কাপুরুষের মতো পালিয়ে আসাটা তার উচিত হয়নি। তার ভাবমূর্তিটা যে একেবারে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল!

বাড়ি ফেরার সময় প্যাংলা অবশ্য বলল, তার ভাবমূর্তির কোনও ক্ষতি হয়নি। পরিস্থিতির চাপে মাঝে-মাঝে নেতাদের ভাবমূর্তি টলোমলো হয় বটে, কিন্তু দু-চারদিনের মধ্যেই আবার আঁট হয়ে বসে যায়। তার কারণ, পাবলিক কোনও ঘটনাই বেশিদিন মনে রাখতে পারে না।

সত্যগোপাল দুঃখ করে বলল, "মাছের ওপর বারোটা কোটেশন মুখস্থ ছিল রে, সেগুলো যে জলে গেল।"

"তাতে কী, বক্তৃতা তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। এই তো কাল কালীতলায় নবীন সঙ্ঘের সঙ্গে ভবতারিণী বিদ্যাপীঠের বিন্ধ্যবাসিনী স্মৃতি শিল্ডের ফাইনাল ফুটবল ম্যাচেও আপনি সভাপতি। কোটেশনগুলো সেখানেই ঝেড়ে দেবেন।"

"দূর! ফুটবলের সঙ্গে কি মাছ যায়!"

"আহা, লোকে অত খতিয়ে দেখে না। এই তো সেদিন তাঁতিপাড়ায় অষ্টপ্রহর মহানাম সংকীর্তনের উদ্বোধনী ভাষণে আপনি পাটচাষিদের দুঃখ আর চিংড়ির ফলন বাড়ানোর কথা বললেন, কেউ কিছু আপত্তি করেছে কি? লোকে তো হাততালিও দিল। বললুম না, লোকে অত তলিয়ে বোঝে না। আপনার বক্তৃতার ডেপ্‌থ বোঝার এলেমই নেই ওদের।"

বাড়ির বাইরেই একটা হোঁৎকা এবং একজন রোগাটে চেহারার

লোক পায়চারি করছিল। রোগা লোকটার পরনে দামি ধাক্কাপেড়ে ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, বাবরি চুল, পুরুষ্টু গোঁফ, পায়ে নাগরা। দেখলে সম্ভ্রম হয়। সত্যগোপালকে দেখে এগিয়ে এসে হাতজোড় করে বলল, "আপনিই সত্যগোপাল ঘোষ? বড়ই সৌভাগ্য আমার।"

সত্যগোপাল বলল, "সভা কোথায় বলুন তো!"

"আজ্ঞে, সভা নয়।"

"তবে কি ফাংশন?"

"আজ্ঞে না।"

"তা হলে নিশ্চয়ই ফুটবল ম্যাচ!""

"আজ্ঞে না। ওসব নয়।"

"কেত্তনের আসরেও আমি যাই বটে। তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। খোল কত্তালের শব্দে আমার বড় মাথা ধরে যায়। তা আপনাদের কেত্তনটা হবে কোথায়?"

"কেত্তনের শব্দে আমার আবার মাথা ধরে না, মাথা ঘোরে।"

"সেটাও খুব খারাপ জিনিস।"

"খারাপ বলে খারাপ! আমাদের ঠাকুরদালানে তো রোজ সন্ধের পর কেত্তনের আসর বসত। বড় বড় কীর্তনীয়া আসত। আমরা ঠাকুর্দা রাজা তেজেন্দ্রনারায়ণের আবার খুব কেত্তনের বাই ছিল কিনা।'

"রাজা! আপনি কি রাজপুত্তুর নাকি মশাই! আগে বলতে হয়! এঃ হেঃ, আপনার এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটা তো ঠিক হচ্ছে না! কী বলিস প্যাংলা?"

প্যাংলা বিগলিত হয়ে বলল, 'সর-ননী খাওয়া শরীর তো, ঘ্যাচাং করে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

লোকটা মৃদু হেসে বলল, "আরে না না। রাজত্বই নেই তো রাজা। রাজাগজা নই। ওই পৈতৃক বাড়িটাই যা আছে। ঠাটবাট বজায় রাখাই কঠিন।"

প্যাংলা বলল, ‘কিন্তু আপনার ঠাটবাট তো কিছু কম দেখছি না। আঙুলে আংটি ঝিলিক মারছে, তা ধরুন দু-চার হাজার টাকা তো হবেই! পায়ের জুতোজোড়াও চমকাচ্ছে, তা ধরুন এক দেড়শো টাকা হেসেখেলে দাম হবে না?”

‘তা হবে বোধহয়। দেওয়ান জ্যাঠা জানেন। কেনাকাটা তো আর আমরা করি না। দেওয়ান জ্যাঠাই করেন।”

সত্যগোপাল বলল, “তা রাজবাড়িটা কি কাছেপিঠে কোথাও?”

“বেশি দূরেও নয়। কেতুগড়ের নাম শুনেছেন কি?”

সত্যগোপাল একটু ভাবিত হয়ে বলল, “তা শুনেছি বোধহয়। নামটা যেন চেনা-চেনা ঠেকছে। কী বলিস রে প্যাংলা?”

“কেতুগড় তো! তা কেতুগড়ের নাম কি আর শুনিনি। কত জায়গারই নাম নিত্যি শুনছি, কেতুগড় আর কী দোষ করল? তা কেত্তনটা হচ্ছে কবে?”

মাথা নেড়ে লোকটা বলল, “কেত্তন হচ্ছে না। আমি বর্তমান রাজা দিগিন্দ্রনারায়ণের ভাইপো নরেন্দ্রনারায়ণ। রাজবাড়ি থেকে সম্প্রতি কিছু জিনিস চুরি গেছে। খবর আছে জিনিসগুলো এই ময়নাগড় এবং আশেপাশেই আছে। আমরা সেগুলো উদ্ধার করতে বেরিয়েছি। বিশেষ করে রুপোয় বাঁধানো একটা বাঁশি।”

সত্যগোপাল অবাক হয়ে বলল, “বাঁশি?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। বহু পুরনো জিনিস। শ’দেড়েক বছর আগে কেতুগড় রাজবাড়ির দরবারে মোহন রায় নামে একজন বাঁশুরে ছিলেন। ভবঘুরে আর ক্ষ্যাপাটে গোছের লোক। মাঝে মাঝে কোথায় উধাও হয়ে যেতেন। কেউ বলত লোকটা মস্ত সাধক, কেউ বলত জাদুকর। তাঁকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তি আছে। চুরি যাওয়া বাঁশিটা তাঁরই। আমরা সেটা উদ্ধার করতে এসেছি। হাজার টাকা পুরস্কার। আপনি তো গণ্যমান্য লোক, সবাই আপনাকে ভারী

ভক্তিশ্রদ্ধা করে। আপনি একটু চেষ্টা করলে বাঁশিটা উদ্ধার হয়।”

“বাঁশিটাই খুঁজছেন কেন বলুন তো?”

“আজ্ঞে, পুরনো জিনিস তো, একটা স্মৃতিচিহ্ন। তা ছাড়া লোকে বলে, ও বাঁশি আর কেউ বাজাতে পারে না। যদিও বা কেউ বাজাতে পারে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে। আমরা আসলে কথাটা বিশ্বাস করি না। গুজবই হবে। তবু বলাও তো যায় না। আমরা চাই না বেঘোরে একটা লোকের প্রাণ যাক। আপনি একটু চেষ্টা করলে বাঁশিটা উদ্ধার হয়। একটা লোকের প্রাণও বাঁচে।”



সন্ধে রাত্তিরে পরাণ চাট্টি পান্তা নিয়ে বসেছে। পান্তা খেয়ে সে একটু গড়িয়ে নেবে। তারপর চটের থলিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। ওই থলিটিতে নানারকম ছোটখাটো যন্ত্রপাতি আছে।

দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। রোজগারপাতি নেই বললেই হয়। এই গরমটা পড়াতেই কাজ ভণ্ডুল হচ্ছে বড়। যত গরম পড়ে ততই লোকে হাঁসফাঁস করে, রাতে ঘুমোতে চায় না, ঘুমোলেও তেমন গভীর ঘুম হয় না। আর গেরস্ত না ঘুমোলে পরাণেরও কাজ হতে চায় না। যতদিন বর্ষা বাদলা না নামছে ততদিন টানাটানি যাবেই। বর্ষা-বাদল হলে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হবে। বৃষ্টির শব্দ আর ব্যাঙের ডাকে মানুষ টেনে ঘুমোবে, আর তখনই পরাণের বরাত খুলবে।

তার বউ গোমড়ামুখো নয়নতারা পান্তা ভাতের থালাটা পরাণের সুমুখে নামিয়ে দিয়ে একটু আগেই বলছিল, ‘চাল কিন্তু তলানিতে ঠেকেছে। কাল একবেলারও খোরাকি হয় কি না কে জানে। বলে

রাখলুম, ব্যবস্থা দেখো।”

পরাণের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। নয়নতারা কটমট করে কথা কয় বটে, কিন্তু অন্যায্য কথা কয় না। কাজকর্মে সে তত পাকাপোক্ত নয়, একথা সে নিজেও জানে। নইলে এই গ্রীষ্মেকালে বদন মণ্ডল, পাঁচু গড়াই, গেনু হালদারের তো রোজগার বন্ধ হয়নি। বদন তো পরশুদিনই রায়বাড়ির গিন্নিমার সীতাহার হাতিয়ে এনে সেই আনন্দে আস্ত বোয়াল মাছ কিনে ফেলল। পাঁচু গড়াই বিষ্টু সাহার দোকান থেকে ক্যাশ বাক্স ভেঙে সাতশো একান্ন টাকা পেয়ে একজোড়া জুতো কিনেছে। গেনু হালদার দিন দুই আগে এক রাতে দু-দুটো বাড়িতে হানা দিয়ে এক পাঁজা রুপোর রেকাবি আর দুটো আংটি হাতিয়ে এনেছে। আর পরাণ একটা পেতলের ঘটিও রোজগার করতে পারেনি। গতকাল অনেক কসরত করে কষ্টেসৃষ্টে সতু ঘোষের বাড়িতে ঘরের জানালার শিক বেঁকিয়ে ঢুকেছিল বটে। শেষ অবধি দুটো কাচের ফুলদানি ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। ফুলদানির তো আর বাজার নেই। বউ সে দুটো ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েছিল। শেষ অবধি তাকে তুলে রেখেছে।

বুকটা দমে গেছে পরাণের। খোরাকির পয়সাটাও না জুটলে তো বউয়ের কাছে মুখই দেখানো যাবে না।

অধোবদনেই পান্তা খাচ্ছিল পরাণ। গলা দিয়ে যেন হড়হড়ে পান্তাও আজ নামতে চাইছে না।

হঠাৎ দরজায় একটা খুটখুট শব্দ হল। শব্দটা মোটেই ভাল মনে হল না পরাণের। কেমন যেন গা ছমছমে শব্দ।

সে চট করে ঘটির জলে হাতটা ধুয়ে ফেলে চাপা গলায় নয়নতারাকে বলল, “আমি মাচানের তলায় লুকোচ্ছি। জিজ্ঞাসাবাদ না করে দরজাটা খুলো না।”

বাঁশের মাচানটার ওপর তাদের কাঁথাকানির বিছানা, মাচানের

তলায় রাজ্যে হাঁড়িকুড়ি। পরাণ গিয়ে হামা দিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। পুলিশ এলেও তার তেমন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। গত কয়েকদিন এ বাড়িতে চোরাই জিনিস আসেনি বললেই হয়। ওই দুটো কাচের ফুলদানি ছাড়া। কাচের ফুলদানি ফঙ্গবেনে জিনিস, তার জন্য কি আর পুলিশ গা ঘামাবে?

নয়নতারা টেমি হাতে নিয়ে উঠে গিয়ে দরজার ভিতর থেকেই সতর্ক গলায় বলল, "কে? কী চাই?"

বাইরে থেকে একটা ঘড়ঘড়ে গলা বলল, "ভয় নেই মা, আমি বুড়ো মানুষ। দরজাটা খোলো।"

দরজা এমনিতেই পলকা, বেড়ালের লাথিতেও ভেঙে যাবে। তার ওপর হুড়কো ভাঙা বলে নারকোলের দড়ি দিয়ে কোনওক্রমে বাঁধা।

নয়নতারা তাই সাতপাঁচ ভেবে দরজাটা খুলেই দিল।

বাইরে দাড়িগোঁফওয়ালা একটা লোক দাঁড়ানো। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে ঢলঢলে একটা রংচটা জামা, পরনে লুঙ্গি, পিঠে একটা বস্তা ঝুলছে।

টেমিটা তুলে ধরে লোকটার মুখটা ভাল করে দেখে নিয়ে নয়নতারা ঝাঁঝের গলায় বলল, "কী চাই?"

লোকটা জুলজুল করে চেয়ে থেকে বলল, "এটাই কি পরাণ দাসের বাড়ি?"

নয়নতারা বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু সে এখন বাড়িতে নেই।"

"শুনেছি সে একজন গুণী মানুষ, তাই দেখা করতে আসা।"

নয়নতারা ঠোঁট উলটে "গুণী না হাতি! যার দু'বেলা দু'মুঠো চালের জোগাড় নেই তেমন গুণীর গলায় দড়ি।"

লোকটা এ কথায় যেন ভারী খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "কথাটা বড্ড ঠিক। তবে কিনা এই পোড়া দেশে গুণের আদরই

বা কই? তা সে গেল কোথায়?"

"তা কি আমাকে বলে গেছে? এ-সময়ে সে কাজে বেরোয়।"

লোকটা ভারী অবাক হয়ে বলে, "এ-সময়ে তার কী কাজ! সন্ধেবেলায় তো তার কাজে বেরোনোর কথা নয়! কাজ তো নিশুত রাতে।"

নয়নতারা সপাটে বলল, "সে সব আমি জানি না, মোট কথা সে বাড়িতে নেই।"

লোকটা গোঁফ দাড়ির ফাঁকে ভারী অমায়িক একটু হেসে বলল, "তা বললে হবে কেন মা, আমি যে টেমির আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, পান্তাভাত পাতে পড়ে আছে এখনও।"

নয়নতারা নির্বিকার মুখে বলল, "ও তো আমি খাচ্ছিলাম।"

"মাচানের তলা থেকে কার যেন শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজও পাচ্ছি যে। আমার কানটা যে বড় সজাগ। হাঁড়িকুড়ির ফাঁক দিয়ে দু'খানা জুলজুলে চোখও দেখা যাচ্ছে!"

পরাণ আর থাকতে না পেরে হামা দিয়ে বেরিয়ে এল। গা-টা একটু ঝেড়েঝুড়ে লোকটার দিকে চেয়ে বলল, "কী মতলব হে তোমার?"

লোকটা মিষ্টি করেই বলল, "বলি দরজার বাইরে থেকেই বিদেয় করতে চাও নাকি? বাড়িতে অতিথি এলে একটু বসতেটসতেও কি দিতে নেই?"

পরাণ একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, "তা ভিতরে এলেই হয়।"

নয়নতারা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। লোকটা ঘরে ঢুকে চারদিক চেয়ে একবার দেখে নিয়ে বলল, "সতু ঘোষের বাড়ি থেকে ফুলদানি দুটো সরালে বুঝি!"

পরাণ অবাক হয়ে বলে, "তুমি জানলে কী করে হে?"

"কয়েকদিন আগে আমিই সতু ঘোষের বউয়ের কাছে দশ টাকায়

ও দুটো বেচে গেছি কিনা।”

নয়নতারা নথ নাড়া দিয়ে বলল, “গুণী লোকের মুরোদটা দেখলেন তো! অন্যেরা কত সোনাদানা চেঁছেপুঁছে নিয়ে আসছে, কত চোরের বউ সোনার চুড়ি বালা বেনারসি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ইনি মদ্দ সারারাত গলদঘর্ম হয়ে এনেছেন দুটো কাচের ফুলদানি! ম্যা গো, ঘেন্নায় মরে যাই।”

লোকটা দাঁড়ি গোঁফের ফাঁকে ঝিলিক তুলে হেসে বলল, “একটা মাদুর টাদুর হবে? তা হলে একটু বসি। অনেক দূর থেকে আসা কিনা, মাজাটা টনটন করছে।”

নয়নতারা একটা ছেঁড়াখোড়া মাদুর পেতে দিল। তারপর ঝংকার দিয়ে বলল, “আর কী লাগবে শুনি!’

লোকটা মাদুরে বসে একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, “তা লাগে তো অনেক কিছু। প্রথমে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল, তারপর একটু চা-বিস্কুট হলে হয়, রাত্তিরে দুটো ডালভাত। কিন্তু বাড়ির যা অবস্থা দেখছি তাতে ভরসা হচ্ছে না। তা বাপু পরাণ, তোমার সময়টা কি খারাপ যাচ্ছে।”

পরাণ মাদুরের আর এক দিকটায় বসে বলল, “তা যাচ্ছে একটু। তবে চিরকাল তো এরকমধারা যাবে না।”

নয়নতারা ফোঁস করে উঠে বলল, “চিরকাল তো ওই কথাই শুনে আসছি। দিন নাকি ফিরবে। তা দিন আর কবে ফিরবে, চিতেয় উঠলে?”

লোকটা তার কামিজের পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে নয়নতারার দিকে চেয়ে বলল, “ঝগড়া কাজিয়ায় কাজ নেই মা, তুমি বরং ওই সামনের মুদির দোকান থেকে যা যা লাগবে কিনে আনো।”

নয়নতারা লজ্জা পেয়ে বলে “না, না আপনি টাকা দেবেন কেন?”

“আহা, আমি তোমার বাপের মতোই। তা ছাড়া, এই পরাণ দাসকে তুমি যত অপদার্থ ভাবো তত নয়। ওর বরাতটাই খারাপ। নইলে ও সত্যিই গুণী লোক। এ টাকাটা গুণী মানুষের নজরানা বলেই ভাবো না কেন?”

নয়নতারা নোটটা নিয়ে পরাণের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, “গুণীর যা ছিরি দেখলুম তাতে পিত্তি জ্বলে গেল বাবা। এই তো গতকালই খগেন চোরের বউ অতসী এসে তার নতুন গোমেদের আংটি দেখিয়ে কত কথা বলে গেল। বলল, ও মা! পরাণদার মতো লাইনের নামকরা লোকের বউ হয়ে এখনও তুই টিনের ঘরে থাকিস, আমার তো দোতলা উঠে গেল। আরও ঠেস দিয়ে কী বলল জানেন? বলল, তোর দেখছি গায়ে সোনাদানা নেই। ঘরে তেমন বাসনপত্র নেই, কাজের ঝি নেই! কেন রে, পরাণদার কি হাতে-পায়ে বাতে ধরেছে নাকি?”

বুড়ো লোকটা খুব মন দিয়ে সব শুনে মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ মা, পরাণের দিনকাল খারাপই যাচ্ছে বটে। তবে আমি যখন এসে পড়েছি তখন আর চিন্তা নেই। তুমি একটু রান্নাবান্নার জোগাড় করো তো দেখি। আমি আবার খিদেটা তেমন সইতে পারি না।”

“এই যে যাচ্ছি বাবা।” বলে নয়নতারা চলে গেল।

পরাণ জুলজুল করে চেয়ে ঘটনাটা দেখে নিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তুমি কে বট হে? মতলবখানা কী? বলি পুলিশের চর নও তো!”

বুড়ো হো হো করে হেসে উঠে বলল, “ওহে পরাণচন্দর, পুলিশেরও ঘেন্নাপিত্তি আছে। তারা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে যাবে কেন বলো তো! এখন অবধি এমন একটা লাগসই কাজ করতে পারোনি যাতে পুলিশের নজরে পড়তে পারো। তোমাকে তারা চোর বলে পাত্তাই দেয় না। বলি চুরি বিদ্যেরও তো বি এ, এম এ আছে,

নাকি? তা তুমি তো দেখছি এখনও প্রাইমারিটাই ডিঙোতে পারোনি।"

ভারী লজ্জা পেয়ে পরাণ অধোবদন হয়ে বলল, "তা কী করা যাবে বলো! আমি কাজে হাত দিলেই কেমন যেন ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা তুমি লোকটি কে? কোথা থেকে আগমন? উদ্দেশ্য কী? বলি ছদ্মবেশে ভগবানটগবান নও তো!"

লোকটা ফের অট্টহাসি হেসে বলল, "পঞ্চাশ টাকা ফেললেই যদি ভগবান হওয়া যায় তা হলে তো কথাই ছিল না হে। ওসব নয়। বাপু হে, শ্রীনিবাস চূড়ামণির নাম শুনেছ কখনও?"

পরাণ তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, "তা আর শুনিনি! নমস্য মানুষ। প্রাতঃস্মরণীয়। লোকে বলে শ্রীনিবাস চূড়ামণির শরীর নাকি রক্তমাংস দিয়ে তৈরিই নয়, বাতাস দিয়ে তৈরি। এতকাল ধরে কত বড় বড় সব চুরি করলেন কেউ কখনও ধরতেও পারল না। কোথা দিয়ে ঘরে ঢোকেন, কোথা দিয়ে বেরিয়ে যান। লোকে বুঝতেও পারে না। একবার নাকি ইঁদুরের গর্ত দিয়ে কার ঘরে ঢুকেছিলেন।"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "আহা, অতটা নয়। তবে হ্যাঁ, আমার বেশ নামডাক হয়েছিল এককালে।"

"অ্যাঁ! আপনি!"

"আপনি-আজ্ঞে করতে হবে না, তুমিটাই চালিয়ে যাও। হ্যাঁ, আমিই শ্রীনিবাস বটে। তবে চুরিচামারি আমি বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি। কিছুদিন কোচিং ক্লাসে ভাল ভাল চোর তৈরি করতুম। এখন তাও করি না।"

"আজ্ঞে, আমার যে কেমন পেত্যয় হচ্ছে না! মাথা ঘুরছে! বুকের ভিতরে ধকধক! এত বড় একটা মানুষ আমার ঘরে পা দিয়েছে! শাঁখ বাজানো উচিত, উলু দেওয়া দরকার!"

শ্রীনিবাস বরাভয়ের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলল, "হবে, হবে। ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। রয়েসয়ে উলুও দিতে পারো, শাঁখও বাজাতে পারো, তবে সব কিছুরই একটা সময় আছে। ওসব হুট করে করতে নেই।"

"তা হলে একটা পেন্নাম অন্তত করতে দিন।" বলে ভারী ভক্তির সঙ্গে শ্রীনিবাসের পায়ের ধুলো নিয়ে জিবে আর মাথায় ঠেকাল পরাণ। তারপর গদগদ হয়ে বলল, "এ যে কাকের বাসায় কোকিল, এ যে বাঘের ঘরে ঘোগ, এ যে শ্রাদ্ধে বিরিয়ানি, এ যে বদনাতে গঙ্গাজল, এ যে নেউলের নাকে নোলক!" শ্রীনিবাস ধমক দিয়ে বলে, "ওরে থাম থাম হতভাগা! উপমার যা ছিরি তাতে ঘাটের মড়া উঠে বসে।"

"আমার যে বুকের মধ্যে বড্ড আকুলি ব্যাকুলি, বড্ড হাঁকপাঁক হচ্ছে! বরং একটু পদসেবা করি, তাতে আবেগটা একটু কমবে।"

"তা করতে পারিস। বেজায় হাঁটা হয়েছে আজ, পা টনটন করছে।"

বলে শ্রীনিবাস মাদুরে শুয়ে ঠ্যাং বাড়িয়ে দিল। পরাণ মহানন্দে পদসেবা করতে করতে বলল, "কাজকর্মে কি আবার নামা হবে বাবা?"

"কেন রে, এই বুড়োটাকে দিয়ে আবার কাজ করাতে চাস কেন? আমার কি রিটায়ার হওয়ার জো নেই?"

"কী যে বলেন বাবা! ভগবান কি রিটায়ার করে, নাকি দেশের রাজা রিটায়ার করে, নাকি ডাক্তার কোবরেজই রিটায়ার করে? তারপর ধরুন যতদূর শুনেছি, বাঘ-সিংহীদেরও রিটায়ার নেই।"

শ্রীনিবাস আরামে চোখ বুজে বলল, "তা তুই আমাকে কোন খাতে ধরছিস? ভগবান, না রাজা, না ডাক্তার, না বাঘ?"

"আজ্ঞে, ভগবান বলেই ধরতুম, তবে পাপ হয়ে যাবে বলে ধরছি

না। একটু কম সম করে ওই রাজা বলেই ধরে নিন।”

শ্রীনিবাস ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “রাজা না হলেও রাজার কাজেই রিটায়ার ভেঙে এই বুড়ো বয়সে বেরোতে হল, বুঝলি?”

“উরেব্বাস! তাই নাকি? রাজার কাজ মানে তো ভাসাভাসি কাণ্ড! কথায় বলে, মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। তা রাজা খরচাপাতি কেমন দিচ্ছে বাবা?”

শ্রীনিবাস ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “রাজাদের আর সেই দিনকাল কি আছে রে হাবা গঙ্গারাম? রাজা দিগিন্দ্রনারায়ণের বাপমশাই রাজা ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ গরম ভাতে দু'হাতা করে ঘি খেতেন, তাঁর এক্কা গাড়ির ঘোড়ার লেজে দামি আতর মাখানো হত যাতে ঘোড়া ছুটলে এক্কা গাড়িতে বসে রাজামশাই ভুরভুরে গন্ধ পান, আসল পাকা সোনার সুতো দিয়ে রাজার নাগরায় নকশা করা হত, তিনদিনের বেশি এক জোড়া নাগরা পরতেন না, চাকরবাকরদের দান করে দিতেন। সেসব দিন তো আর নেই। দিগিন্দ্রনারায়ণের তো এখন পোলাও খেতে ইচ্ছে হলে রানিমা সর্ষের তেলে ভাত ভেজে দেন, রাজবাড়িতে এখন ছেঁড়া গামছাখানাও সেলাই করে ব্যবহার করা হয়, রাজমাতা মিতব্যয়িনী দেবীকে আর আলাদা করে একাদশী করতে হয় না, রোজই তাঁর একাদশী।”

“এঃ হেঃ, আপনার মতো গুণী মানুষ এরকম একটা দেউলে রাজার হয়ে খাটছেন কেন বাবা? দেশে কি রাজাগজার অভাব?”

“রাজার হয়ে খাটছি তোকে কে বলল?”

“তা হলে এই যে বললেন রাজার কাজ!”

“তা বলেছি বটে, তবে তার মানে রাজার হয়ে খাটা নয় রে। মানেটা একটু খটোমটো, তুই ঠিক বুঝবি না। তবে কাজটা রাজবাড়ি সংক্রান্তই বটে।”

পরাণের চোখদুটো এবার ভারী জুলজুল করে উঠল। একগাল হেসে সে বলল, " তাই বলুন! এবার তা হলে রাজবাড়ি খালাস করবেন! এ না হলে ওস্তাদ! আপনার মতো মান্যগণ্য ওস্তাদের কি আর গেরস্তবাড়ির কাজে মানায়! প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ আপনি। আর পুরনো রাজবাড়িগুলোয় মেলা কোনা-ঘুপচি, চোরকুঠুরি, কোথায় গুপ্তধন আছে কে জানে বাবা। তা বাবা, আপনার একজন স্যাঙাতট্যাঙাত দরকার নেই? আপনার পায়ের নখেরও যুগ্যি নই বটে, কিন্তু সোনাদানা তো ওজনদার জিনিস, আপনি বুড়ো মানুষ অত কি বইতে পারবেন? সেসব না হয় আমিই বয়ে দেবখন।"

"সেসব হবেখ'ন। অত উতলা হচ্ছিস কেন? তার আগে বল তো, তুই কি ইংরিজি জানিস?"

হাত কচলে লাজুক হেসে পরাণ বলে, "কী যে বলেন। বাংলাটাই ভাল করে আসে না তো ইংরিজি! তবে কিনা বলা-কওয়ার দরকারও পড়ে না তো। হাত-পা সচল থাকলেই হল।"

মাথা নেড়ে শ্রীনিবাস বলে, "উঁহু, ওটা কাজের কথা হল না। ভাল কারিগরের সব কিছুই সচল থাকা দরকার। হাত, পা, মগজ, বুলি, কোনটা না হলে চলে?"

"আজ্ঞে, ইংরিজির কথাটা কেন উঠছে বাবা? জানলে কিছু সুবিধে হবে?"

"তা হবে বইকী, ওই যে ফুলদানি দুটো চুরি করে এনেছিস, কখনও ভাল করে উলটেপালটে দেখেছিস?"

পরাণ অবাক হয়ে বলে, "না তো! কাচের ফুলদানি দেখে বউটা এমন মুখনাড়া দিল যে, আর ওটার দিকে ফিরেও তাকাইনি। বউ তো ফেলে দিতেই চেয়েছিল, কী ভেবে ফেলেনি।"

"ঘটে বুদ্ধি থাকলে ফুলদানি দুটো উলটে দেখলে দেখতে

পেতিস, ওগুলোর নীচে ইংরিজিতে লেখা আছে, আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ও জিনিস বিলেতে তৈরি হয়েছিল। স্ফটিক কাচের তৈরি। সমঝদার খদ্দের যদি পাস, কত দাম দিতে পারে জানিস?"

বড় বড় চোখে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে শশব্যস্ত পরাণ বলে, "কত হবে বাবা, একশো দেড়শো?"

"দূর পাগল! একশো দেড়শো কী রে? যদি সাহেব খদ্দের পাস তবে হেসেখেলে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা। দিশি খদ্দের কিছু কম দিতে চাইবে, তাও ধর ওই আট-দশ হাজার।"

"তবে যে আপনি দশ টাকায় বেচে দিলেন!"

শ্রীনিবাস একটু হেসে বলল, "বেচব না তো কি চোরাই জিনিস বয়ে বেড়াব? আর বেচা মানে কি আর সত্যিই বেচা নাকি? ও হল গচ্ছিত রাখা। যেমন ব্যাঙ্কে লোকে টাকা রাখে আবার দরকার মতো তুলে নেয়, এও হল তাই। এ-গাঁয়ের ঘরে ঘরে অমন আমার কত জিনিস গচ্ছিত রাখা আছে। দরকার মতো সরিয়ে নেব বলেই রেখেছি।"

"পায়ের ধুলো দিন ওস্তাদ!" বলে ভক্তিভরে ফের শ্রীনিবাসের পায়ের ধুলো নিয়ে পরাণ শশব্যস্তে বলল, "দেখেছেন বাবা নয়নতারার কাণ্ডটা! অত দামি জিনিস কেমন অচ্ছেদ্দায় কুলুঙ্গিতে তুলে রেখেছে! ষষ্ঠী গুণের মেয়ে হয়ে তার আক্কেলটা দেখলেন! পড়ে ভাঙবে যে!"

"অত উতলা হোসনে। তোর হাত কাঁপছে যে! উত্তেজনার বশে ফুলদানির ওপর গিয়ে হামলে পড়লে তোর হাতেই ভাঙবে। বউমা আসুক, সাবধানে তুলে রাখবে'খন।"

"না বাবা, দামি জিনিসের অমন অযত্ন সহ্য হয় না।"

একটু হেসে শ্রীনিবাস বলে, "দামি জিনিস বলে বুঝতে পারলে

কি আর অযত্ন করত? কোন জিনিসের কী দাম তা ক'জন বোঝে বল দিকি! তাই তো বলছিলাম, কারিগর হতে গেলে হাতে পায়ে দড় হলেই হয় না, মগজ চাই, চোখ চাই, পেটে একটু বিদ্যে চাই।

গদগদ হয়ে পরাণ বলে, "আপনাকে যখন পেয়ে গেছি, এবার সব শিখে নেব।"

"শোন হতভাগা, হুটপাট করার দরকার নেই, ও দুটো জিনিস একটু ঢাকা চাপা দিয়ে রাখিস। দুটো লোক কাল থেকে ওসব চোরাই জিনিসের খোঁজে এ তল্লাটে ঘুরঘুর করছে।" পরাণ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে, "সর্বনাশ। তা হলে উপায়?"

"ঘাবড়াসনি। তারা দুটিও তোর মতোই মর্কট। এসব জিনিসের মর্ম তারাও বোঝে না। ডবল দাম দিয়ে কিনে নেবে বলে সবাইকে ভরসা দিচ্ছে। আসলে ডবল দাম দেওয়ার মুরোদও তাদের নেই। তারা শুধু খোঁজ নিচ্ছে কার বাড়িতে কোন জিনিসটা আছে। জেনে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মাল সাফাই করবে।"

"সেটাও তো ভয়ের কথা।"

"তোর এই ভাঙা বাড়ির দিকে তারা নজরও দেবে না বটে, তবু সাবধান থাকা ভাল। আসলে তারা একটা জিনিসই হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেটা পেয়ে গেলে অন্য জিনিসগুলো নিয়ে তারা বিশেষ মাথা ঘামাবে না।"

"সেটা কী জিনিস বাবা?"

শ্রীনিবাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ রে, নয়নতারা এত দেরি করছে কেন বল তো!"

"আজ্ঞে, এ-বাড়িতে তো বহুকাল মান্যগণ্য কেউ আসেনি। আজ আপনার সম্মানে বোধহয় ভালমন্দ কিছু রাঁধবে।"

"অ। তা ভাল।"

শ্রীনিবাসের পা আরও জোরে দাবাতে দাবাতে পরাণ বলল,

"জিনিসটা কী তা এই বেলা বলে ফেলুন বাবা। নয়নতারার সামনে গুহ্যকথাটথা না বলাই ভাল। মেয়েদের সামনে গুহ্যকথা বললে বড় ভজঘট্ট লেগে যায়। ওদের পেটে কথা থাকে না কি না, পাঁচকান হয়ে পড়ে।"

"অত হুড়ো দিচ্ছিস কেন রে? সব কথা উপর্যুপরি বলে ফেলাই কি ভাল? কথারও তো দিনক্ষণ, লগ্ন আছে, নাকি? যখন তখন যেমন তেমন কথা বললেই তো হবে না। ভাল করে ভেবেচিন্তে নিকেশ করে বলতে হবে। একটু জিরোই, তারপর চাট্টি খাই, তারপর একটু ঘুমনোও তো দরকার বুড়ো মানুষটার নাকি? বিছানাপত্তরের যা ছিরি দেখছি তাতে ঘুমটাই কি আর হবে?"

শশব্যস্ত পরাণ বলল, "চিন্তা নেই বাবা, মাচানের ওপর আরও কয়েকটা বস্তা পেতে নরম বিছানা করে দিচ্ছি। আরামে শোবেন। আমরা না হয় পাশের ঘরে মাদুর পেতে ঘুমোব।"

"তা সেই ব্যবস্থাই ভাল। লোক দুটোর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে তোর বাড়িতেই কয়েকদিন থানা গেড়ে থাকতে হবে। এই একশোটা টাকা রাখ। কাল গিয়ে ভাল করে বাজার করে দু'দিন ভালমন্দ খা দিকি। রাতের কারিগরদের ভালমন্দ খেতে হয়, নইলে এ কাজের হ্যাপা সামলাবি কী করে। ওই হাড়গিলে ল্যাকপ্যাকে কমজোর চেহারায় যে দশটা লোকের কিলও হজম করতে পারবি না। তোর মতো বয়সে আমাকে একশো লোক মিলে হাটুরে মার দিয়েও কিছু করতে পারেনি। পাগলুর হাটে তো একবার বাঁশডলা দেওয়ার পর পুকুরের জলে চুবিয়ে রেখেছিল। প্রাণায়ামের জোরে প্রাণবায়ুটুকু আটকে রাখতে পেরেছিলুম। বুঝেছিস?"



পেটে কিছু পড়লেই বিষ্ণুরাম দারোগার ঘুম পায়। মোটাসোটা মানুষ, খোরাকটাও একটু বেশিই। তা বলে বিষ্ণুরামকে কেউ অলস ভাবলে ভুল করবে। বছরতিনেক আগে যখন এখানে প্রথম এল, তখন এসেই ট্যাঁড়া পিটিয়ে পাঁচ গাঁয়ের লোককে জড়ো করে একটা বক্তৃতা দিয়েছিল। সেই অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় বলেছিল, "ভাইসব, এলাকার শান্তি যেন বজায় থাকে। আমি জানি, চোর ভারতবাসী, ডাকাত ভারতবাসী, খুনি ভারতবাসী, জোচ্চোর এবং ঘুষখোর ভারতবাসী আমার ভাই। তাদের ধমনীতে যে রক্ত বইছে, আমার ধমনীতেও সেই রক্তই বইছে। তাদের শরীরের এক ফোঁটা রক্তপাত হলে সেটা হবে আমারই রক্তপাত। তাদের দণ্ডদান করা মানে আমাকেই দণ্ডদান করা। তাই কবি বলেছেন, দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতাও যখন কাঁদেন তখন সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। সুতরাং কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও বলতে চাই, আজ থেকে যেন ময়নাগড় এবং আশপাশের অঞ্চলে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। তাই আমি বলি, এসো চোরগণ, শুচি করি মন, ধরো ডাকাতের হাত, মোর অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, অকারণে কেউ পোড়ো না কো ধরা, সবার হরষে হরষিত মোরা দুঃখ কী রে?

"আমি তাদের কবির অমোঘ বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কারার ওই লৌহকপাট, ভেঙে ফ্যাল কর রে লোপাট, রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণবেদী। আমি জানি অনেকেই পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে আমাকে প্রশ্ন করবেন, এতদিন কোথায় ছিলেন? আমি তাদের বলব, তোমার মিলন লাগি আমি আসছি কবে থেকে।

বাউলের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আজ আমার বলতে ইচ্ছে করছে, আমি আইলাম রে, খাটাইশ্যা বৈরাগী, রূপে গুণে ষোলো আনা ওজনে ভারী। আমি জানি এই হানাহানি, কানাকানি এবং টানাটানির যুগে শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। তবু ভাইসব, শত্রুপক্ষ আচমকা যদি ছোঁড়ে কামান, বলব বৎস, সভ্যতা যেন থাকে বজায়, চোখ বুজে কোনও কোকিলের দিকে ফেরাব কান। বিশদ করে বলতে গেলে বলতে হয়, ধরুন দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া, হঠাৎ শুনলেন রাতের কড়া নাড়া। হেঁড়ে গলায় কেউ ডেকে উঠল, অবনী বাড়ি আছ? খবর্দার জবাব দেবেন না কিন্তু, দরজাও খুলবেন না। তবে যদি সে নিতান্তই দরজা ভেঙে টেঙে ফেলে তা হলে চটবেন না। হেসে বলবেন, ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারই হউক জয়।"

বক্তৃতা শুনে ভয় খেয়ে পঁচাশি বছরের নন্দকিশোর নব্বই বছর বয়সী কৃষ্ণকিশোরকে বললেন, "এ তো দেখছি একটা চোরডাকাতের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠল!"

কৃষ্ণকিশোর কানে শোনেন না। একগাল হেসে বললেন, "তাই নাকি? আমি তো আগেই বলেছিলুম, এই দারোগা গাঁয়ে পা দেওয়ার পরই আমার বাঁ চোখ নাচছে। অতি শুভ লক্ষণ, বাঁ হাঁটুর ব্যথাটাও তেমন টের পাচ্ছি না। হপ্তাখানেক আগে আমার দুধেল গাই নন্দরানি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। গতকাল নন্দরানি দিব্যি গুটিগুটি ফিরে এসেছে। চারদিকেই শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। আর বক্তৃতাটাও কেমন বলো! সেই উনিশশো তেইশে গাঁধীজির বক্তৃতা শুনেছিলুম, আর এই শুনলুম, কী তেজ, কী বীরত্ব, কী বলব রে ভাই, বক্তৃতার হলকায় তো কানে আঙুল দিতে হয়।"

দিনতিনেক বাদে গোবিন্দলাল থানায় গিয়েছিল ঘটি চুরির নালিশ জানাতে।

বিষ্ণুরাম হাসিহাসি মুখ করে বলল, "মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ

কী জানো?"

"আজ্ঞে! জানি, তবে ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।"

"মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ হল ক্ষমা। সারাদিন যত পারো ক্ষমা করে যাও। যাকে সুমুখে পাবে তাকেই ক্ষমা করে দেবে।"

"যে আজ্ঞে, সে না হয় করলুম, কিন্তু এই ঘটিচুরির বৃত্তান্তটা একটু শুনুন।"

"যিশু খ্রিষ্ট কী বলেছিলেন?"

"আজ্ঞে, জানতুম, তবে এখন ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। ইংরিজিতে বলতেন তো!"

"যিশু বলেছিলেন, কেউ তোমাকে এক গালে চড় মারলে আর এক গাল এগিয়ে দাও। সে গালেও যদি চড় মারে তবে ফের আগের গালটা এগিয়ে দাও। যদি সে গালেও মারে তবে ফের দ্বিতীয় গাল এগিয়ে দাও। সেও চড় মেরে যাবে তুমিও গালের পর গাল এগিয়ে দিতে থাকবে। এইভাবে মারতে মারতে আর কত পারবে সেই চড়বাজ! দেখবে সে একটা সময়ে চড় মারতে মারতে হেদিয়ে পড়ে মাটিতে বসে হ্যা-হ্যা করে হাঁফাচ্ছে। বুঝলে?"

"আজ্ঞে, জলের মতো। তবে কিনা ঘটিচোর আমাকে চড় মারেনি, তাকে জাপটে ধরেছিলুম বলে সে আমাকে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে।"

"একটা টেট ভ্যাক ইনজেকশন নিয়ে নাও। আর ঘটিচোর তোমার একটা ঘটি নিয়ে গেছে, তাতে কী? তাকে পেলে আর একটা ঘটি দিও। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছেন?"

"আজ্ঞে, ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।"

"শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, নমো হে নমো, ক্ষমো হে ক্ষমো, পিত্তরসে চিত্ত মম.... আর কী সব আছে যেন। মোট কথা মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ হল, ক্ষমা। মনে থাকবে তো!"



"আজ্ঞে, মৃত্যুর দিন অবধি মনে থাকবে। ঘটিচুরির শোক কি সহজে ভোলা যায়! যতবার ঘটিচুরির কথা মনে পড়বে ততবার আপনার কথাও মনে পড়বে।"

গত দশবছর ধরে বিষ্ণুরাম চারদিকে ক্ষমার গঙ্গাজল ছিটিয়ে ছিটিয়ে জায়গাটাকে একেবারে জব্দ করে রেখেছে। থানায় বড় কেউ একটা নালিশ করতে আসে না। চোরছ্যাঁচড়-ডাকাতরা বিষ্ণুরামকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করে। কাজকর্ম তেমন না থাকায় বিষ্ণুরাম আর তার সেপাইরা যে যার চেয়ার বা টুলে বসে দিবানিদ্রাটি সেরে নিতে পারে।

আজ বিষ্ণুরামের বউ সকালে ঢাকাই পরোটা আর মাংসের ঘুঘনি করেছিল। সুতরাং সকালে গুরুতর জলযোগের পর বিষ্ণুরাম থানায় এসে নিজের চেয়ারটিতে বসে ঢুলছে। কোমরের পিস্তল সমেত বেল্টটি খুলে টেবিলের ওপর রাখা। গুরুভোজনের পর বিষ্ণুরাম কোনও দিনই কোমরে বেল্ট পরা পছন্দ করে না।

একটু বেলার দিকে রোগামতো একটা ক্যাঁকলাস চেহারার লোক ভারী সন্তর্পণে নিঃশব্দে থানায় ঢুকল। পরনে পাজামা, গায়ে একখানা সবুজ কুর্তা, মাথায় জরি বসানো একটা পুরনো কাশ্মীরি টুপি। থুঁতনিতে একটু ছাগুলে দাড়ি আছে, চিনেদের মতো গোঁফজোড়া দু'দিকে ঝুল খেয়ে আছে। মুখে একখানা হাসি, বড় বড় দাঁতে পানের ছোপ।

বিষ্ণুরামের ঘরে ঢুকে সে একটা গলা খাঁকারি দিয়ে ভারী বিগলিত মুখে বলল, "বড়বাবু কি চোখ বুজে আছেন?"

বিষ্ণুরাম ঘুমের মধ্যেই জবাব দিল, "আছি।"

"বুজেই কি থাকবেন?"

"থাকব।"

"হেঃ হেঃ, আপনি যে বোজা চোখেও সব দেখতে পান তা কে

না জানে! শুধু দেখা! দু খানা করে চোখ তো আমাদেরও আছে, কিন্তু কতটুকুই বা দেখি আমরা! গোরুকে মোষ দেখছি, মেয়েছেলেকে ব্যাটাছেলে দেখছি। কালোকে সাদা দেখছি। পূর্ণিমাকে অমাবস্যা দেখছি, পিসেকে জ্যাঠা দেখছি, সাপকে বেজি দেখছি। চোখ থেকেও নেই। আর লোকে বলে, বিষ্টু দারোগাকে দেখে মনে হয় বটে যে, ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু তার দু খানা চোখ হাটে মাঠে ঘাটে ঠিক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই তো সে দিন মদন সরখেল বলছিল, গোরু বেচে ট্যাঁকে টাকা নিয়ে ফেরার সময় মাঝরাত্তিরে পালঘাটের শ্মশানের কাছে বটতলায় অন্ধকারে দু'খানা জ্বলন্ত চোখকে ঘুরে ঘুরে চারদিকে নজর রাখতে দেখেছে। বলছিল ট্যাঁকে গোরু বিক্রির টাকা ছিল বলে ভয়ে ভয়ে আসছিলুম বটে, বিষ্টু দারোগার চোখ দুটো দেখেই ভয় কেটে গেল। মনে হল আর কীসের ভয়! বিষ্টু দারোগার জয়।"

"বলে নাকি?"

"তা বলবে না? দিনু কুণ্ডুও তো বলল, ভাই, বাড়িতে জামাই এসেছে বলে রোজকার মতোই গিন্নীর নথ বন্ধক রেখে বাজারে গিয়ে একটা ইলিশ মাছ আশি টাকা দিয়ে কিনে এক হাতে আনাজপাতি অন্য হাতে মাছের থলে নিয়ে ফিরছি। ফেরার পথে শীতলার থানে পেন্নাম করব বলে মাছের থলিটা বাইরের রকে রেখে জুতো ছেড়ে মন্দিরে ঢুকেছি। এমন সময়ে ন্যাড়া পোদ্দারের সঙ্গে দেখা। পোদ্দারের পো এমনিতেই বেশি কথা কয়। সেদিন আবার তার পিসশ্বশুরের বাতব্যাধির কথা পেড়ে ফেলায় কিছুতেই ছাড়াতে পারি না। যাই হোক ওইসব কথাবার্তার ফাঁকেই মাছের কথা বেবাক ভুলে বাড়ি আসতেই গিন্নি যখন চিল-চেঁচানি চেঁচিয়ে উঠল, ওকী গো, জামাই এয়েছে বলে মাছ আনতে পাঠালুম নথ বাঁধা দিয়ে, আর তুমি খালি হাতে ফিরে এলে যে বড়! তখন খেয়াল হল, তাই তো,

মাছটা তো শীতলা মন্দিরের বাইরের রকে ফেলে এসেছি! চটকা ভাঙতেই ছুট, ছুট! গিয়ে কী দেখলুম জানো? বললে বিশ্বাস হবে না, যেমনকে তেমন থলিবন্দি হয়ে পড়ে আছে, গাঁয়ে আঁচড়টুকু লাগেনি। কুকুর-বেড়াল বা কাক পক্ষী কাছেও ঘেঁষেনি। আর দেখলুম বিষ্টু দারোগার দুখানা বাঘা চোখ আম গাছটার ওপর বসে মাছটার ওপর নজর রাখছে। যাতে কেউ মাছের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে না পারে!"

নাকের ডাকের মধ্যেই বিষ্ণুরাম অভ্যাসবশে বলে উঠল, "বটে!"

"তবে আর বলছি কী বড়বাবু! চোখ বুজে আছেন বটে, লোকে দেখলে ভাববে ঘুমোচ্ছেন, কিন্তু এলাকার শান্তি বজায় রাখতে আপনি যে দু'চোখের পাতা কখনও এক করেন না সেটা শুধু আমরা কয়েকজন ভুক্তভোগীই জানি।"

"বলে যা।"

বিগলিত হয়ে লোকটা বলল, "আজ্ঞে। বলব বলেই আসা। আপনার চট্‌কাটা ভাঙলে ধীরেসুস্থে বলা যাবে।"

বিষ্ণুরাম রক্তচক্ষু মেলে চেয়ে ঘড়ি দেখল। বলল, "বারোটা বাজে যে! আমার তো এখন খিদে পাওয়ার কথা।"

"আজ্ঞে, পেয়েছেও। কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকেন, আপনার কি আর নাওয়া-খাওয়ার কথা খেয়াল থাকে? শরীরটা হয়তো এখানে পড়ে আছে, আপনি কি আর হেথায় আছেন! হয়তো শরীরটা ফেলে রেখে আপনি এখন অশরীরে কালীপদর আমবাগান পাহারা দিচ্ছেন। কালীপদর আমবাগানে এবার আমের গুটিও ধরেছে ঝেঁপে, দুষ্টু ছেলে আর হনুমানের উৎপাতে কালীপদ জেরবার। কিংবা হয়তো সত্যগোপালের বাড়িতে যে-চোরটা ক'দিন আগে ঢুকে দুটো ফুলদানি নিয়ে গিয়েছিল তারই পিছু-পিছু ধাওয়া করে

আলায়-বালায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিংবা যে-দুটো সন্দেহজনক লোক ক'দিন হল ময়নাগড়ে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে তাদের খেদিয়ে নিয়ে তেপান্তরের মাঠ পার করে দিচ্ছেন। তাই বলছিলুম, ওই দেহে কি আর খিদেতেষ্টা আছে? আছে শুধু কাজ, শুধু কর্তব্য, শুধু দায়-দায়িত্ব। দারোগা মানে তো ধরুন একরকম দেশের রাজাই।"

বিষ্ণুরাম একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে বলল, "দ্যাখ নবু, তোর একটা দোষ কী জানিস? বড্ড বেশি কথা কয়ে ফেলিস। আজই যদি সব কথা বলিস তা'হলে কালকের জন্য থাকবে কী?"

নবু ভারী গ্যালগ্যালে হয়ে বলল, "আজ্ঞে আপনার কথা ভাবলেই আমার কেমন বেগ এসে পড়ে। সামলাতে পারি না।"

"দ্যাখ তোর বলা-কওয়া কিছু খারাপও নয়, আর উচিত কথাই বলিস। শুনতে ভালও লাগে। এই যে সেদিন তুই আমার তৃতীয় নয়ন, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, জাগ্রত বিবেক আর ব্যাঘ্র-বিক্রমের কথা বলছিলি সেগুলো হয়তো তেমন মিথ্যেও নয়। তবু ভাবি কী জানিস! ভাবি, সত্যিই কি তাই? নবুটা হয়তো বাড়িয়ে বলছে। অত গুণ থাকলে কি আমি এই অখদ্দে ময়নাগড়ে পড়ে আছি! কবে প্রমোশন পেয়ে ভাল জায়গায় চলে যেতাম।"

চোখ বড় বড় করে ডুকরে উঠে নবু বলল, "আপনি চলে গেলে যে ময়নাগড়ের অবস্থা শচীমাতার মতো হয়ে দাঁড়াবে। কাঁদে ময়নাগড় কোথা বিষ্ণুরাম, প্রতিধ্বনি বলে থাম, থাম, থাম, ময়নাগড়ে আর নাই ঘনশ্যাম। সেদিন পরেশ পালও বলছিল, বিষ্টু দারোগা চলে গেলে ময়নাগড় জঙ্গলের রাজত্ব হয়ে উঠবে। দিনে-দুপুরে বাঘ ডাকবে, গুণ্ডায় গুণ্ডায় গুণ্ডার রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়াবে, হাতির পাল ঢুকে পড়বে ঘরেদোরে।"

"বলে নাকি?"

"তা বলবে না? তখন ঘরে ঘরে অরন্ধন হবে, মেয়েরা চুল বাঁধবে

না, ছেলেরা টেরি কাটতে ভুলে যাবে, জটাধারী বোষ্টম ন্যাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াবে। অশোকবনে সীতার মতো অবস্থা হবে ময়নাগড়ের।”

বিষ্ণুরাম ফোঁস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, “সরকার বাহাদুর কি আর চিরকাল আমাকে এখানে রাখবে রে? চারদিক থেকেই যে ডাক আসছে। উত্তরমেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণমেরু টানে। তা সেসব কথা থাক। বলি চারদিককার খবরটবর আনলি কিছু?”

একগাল হেসে ঘাড়টাড় চুলকে নবু বলে, “আজ্ঞে, খবর তো মেলা। ননীগোপালবাবুর ছাগল হারিয়েছে, বিন্ধ্যবাসিনী দেবী বেলপানা খেতে গিয়ে তাঁর বাঁধানো দাঁত গিলে ফেলেছেন, মদন সাঁপুই কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙেছে, গণেশ তফাদার কেলো মণ্ডলকে হনুমান বলায় কেলো মণ্ডল তাকে জাম্বুবান বলেছে এবং দু'জনে হাতাহাতি লেগে যাওয়ায় গণেশের তিন ছেলের সঙ্গে কেলোর পাঁচ ছেলের মারপিট হয়েছে। চুরি ছিঁচকেমির কয়েকটা ঘটনা আছে বটে, কিন্তু সেগুলো আপনার পাতে দেওয়ার যুগ্যি নয়। আর নয়নপুর ঘোষবাড়ি, কালিরহাটে নরেন দাসের বাড়ি, পঞ্চাননতলায় গিরিন পোদ্দারের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। তবে ওসব আপনার গায়ে মাখবার দরকার নেই। ঘোষ, দাস আর পোদ্দারেরা আপনার কথামতো ডাকাতদের ক্ষমাঘেন্না করেও দিয়েছে। তবে কিনা বড়বাবু, দুটো সন্দেহজনক লোক বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটার তো ঘটোৎকচের মতো চেহারা, অন্যটা কাপ্তেনের মতো।”

“তারা কারা?”

“বলছে কোনও রাজবাড়ির লোক। কিন্তু ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না। তারা চোরাই জিনিস খুঁজছে।”

বিষ্ণুরাম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, “তা খুঁজছে খুঁজুক না। তাদের ঘাঁটানোর দরকারটা কী? ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে শেষে

থানায় এসে আবদার করবে চোরাই জিনিস খুঁজে দিতে। শান্তিতে কি থাকার জো আছে রে? মানুষের যেন আর নালিশের শেষ নেই। এই তো সেদিন সুধন্যবাবু নস্যির ডিবে খুঁজে পাচ্ছেন না বলে থানায় এফ আই আর করতে এসেছিলেন।

হাত কচলে নবু বলল, "এ একেবারে ন্যায্য কথা। মাথামোটা লোকগুলোর তো আক্কেল নেই। তারা বোঝেও না যে, বড় দারোগার গুরুতর সব কাজ থাকে। ছোটখাটো ব্যাপারে নজর দেওয়ার তাঁর সময় কোথায়! তবে কিনা বড়বাবু, অভয় দেন তো শ্রীচরণে একটু গুহ্য কথা নিবেদন করি। কয়েকদিন আগে একটা পাগলামতো দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোক বাড়ি বাড়ি ঘুরে হরেকরকম চোরাই জিনিস বিক্রি করছিল। সে বলেছিল বটে যে, কোনও রাজবাড়ি থেকে নিলামে কিনে এনেছে, কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করার মতো নয়। ভারী শস্তায় দিচ্ছিল বলে লোকে কিনেও নিচ্ছিল। লোকটা যে পাগল আর গবেট তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ, তিনখানা নাকি সোনার রেকাবি— তা ধরুন পঞ্চাশ ভরি ওজন তো হবেই— মাত্র দেড়শো টাকায়, আর দু'খানা হিরের আংটি মাত্র একশো টাকায় আপনার বাড়ির গিন্নিমার কাছেই বেচে গেছে।"

"বলিস কী?"

"আজ্ঞে, তাই তো বলছিলাম, যে লোকদুটো চোরাই জিনিসের সন্ধানে এসেছে তারা যদি গন্ধ পায় তা হলে—"

বিষ্ণুরাম তার মোটা শরীর নিয়েও তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পিস্তলটা খাপ থেকে বের করে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "এক্ষুনি লোক দুটোকে ধরে এনে ফাটকে পোরা দরকার, এক্ষুনি! ওরে কে কোথায় আছিস—"

নবু বিচলিত না হয়ে ঠাণ্ডা গলায় ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, "হুটপাট করার দরকার নেই বড়বাবু। রেকাবি তিনটে আর আংটি

দুটো মা ঠাকরোন খুব যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছেন, কাকপক্ষীতেও জানে না।"

উত্তেজিত বিষ্ণুরাম বলল, "তা হলে তুই জানলি কী করে?"

নবু একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে, আমি যে ইনফরমার, না জানলে কি আমার পেট চলবে?"

বিষ্ণুরাম ধপ করে ফের চেয়ারে বসে পড়ল। বড় বড় শ্বাস ফেলে বলল, "সোনার রেকাবি? ঠিক জানিস?"

"গিন্নিমা যে কালোবরণ স্যাঁকরাকে দিয়ে যাচাই করেছেন।"

"তার মানে কালোবরণও জানে! না না, এত জানাজানি তো ভাল কথা নয়।"

"আজ্ঞে, সোনা যাচাই করতে হলে স্যাঁকরা ছাড়া উপায় নেই কিনা।"

উত্তেজিত হয়ে বিষ্ণুরাম বলল, "গিন্নির আক্কেল দেখে বলিহারি যাই! একবার আমাকে বলবে তো! ঘরে অত সোনা, ভালরকম পাহারা বসানো দরকার।"

বিগলিত হয়ে নবু বলে, "আপনার বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর আমাদের যেমন অগাধ আস্থা, গিন্নিমার বোধহয় ততটা নেই। না থেকে একরকম ভালই হয়েছে। বাড়িতে সেপাইসান্ত্রি বসালে পাঁচজনের সন্দেহ হতে পারে।"

বিষ্ণুরাম ভ্রূকুটিকুটিল চোখে নবর দিকে চেয়ে বলল, "কথাটা পাঁচকান করার দরকার নেই।"

"কোন কথাটা আজ্ঞে?"

"ওই যে, আমার ওপর যে গিন্নির আস্থা নেই। ওসব কথা চাউর হলে লোকে কি আর আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করবে?"

"কী যে বলেন বড়বাবু, কথাটা তো আমি ভুলেই গেছি।"

"লোক দুটো এখন কোথায়?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নবু বলল, “তাদের বড় দুঃসাহস বড়বাবু।”

বিষ্ণুরাম চোখ পাকিয়ে বলে, “দুঃসাহস! কেন, আমি কি মরে গেছি নাকি রে!”

মুগ্ধ চোখে দারোগা বিষ্ণুরামের দিকে চেয়ে নবু গদ গদ হয়ে বলে, “সেই পোজ, সেই পশ্চার, সেই গলা! আহা, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!”

“কে? কার কথা কইছিস!”

“আজ্ঞে, টিপু সুলতানের কথাই বলছি। গেলবার শীতলা মন্দিরের পাশের মাঠটায় টিপু সুলতান পালা নেমেছিল। জয় হনুমান অপেরা। নটসিংহ মহেন্দ্র বরাট টিপু সুলতানের ভূমিকায়। কী তেজ, কী গলা, কী দাপট। সেই দেখেছিলাম, আর এই আজ দেখছি! কোথায় লাগে মহেন্দ্র বরাট!”

উত্তেজিত হয়ে বিষ্ণুরাম বলে, “তারা এসে পড়লে কি আর সোনাদানা কিছু ঘরে থাকবে রে! সব যে চেঁছেচুঁছে নিয়ে যাবে?”

“কোন আইনে?”

“আইন! আইনের কথা উঠছে কেন?”

নবু বিজ্ঞের মতো একটু হেসে বলল, “দেশে কি আইন নেই বড়বাবু? আইনের মাথায় নৈবেদ্যের ওপর কাঁঠালি কলার মতো আপনিও তো আছেন! তারা এসে হাত পেতে দাঁড়ালেই তো হবে না। রেকাবি আর আংটি যে গিন্নিমার হেফাজতে আছে এটা কারও জানার কথা নয়। আর থাকলেই বা কী? ওটা গিন্নিমার পৈতৃক সম্পত্তি যে নয় তার প্রমাণ কী? মালটা যে চুরি গিয়েছিল তারই বা সাক্ষী কোথায়? আপনি গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন তো।”

নবু কথা শেষ করার আগেই নরেন্দ্রনারায়ণ ঘরে ঢুকল, পিছনে সেই বিশাল চেহারার লোকটা।

নরেন্দ্রনারায়ণকে দেখেই বিষ্ণুরাম হঠাৎ ফের দাঁড়িয়ে বিকট

গলায় চেঁচাতে লাগল। "কে তোরা! অ্যাঁ! কে তোরা! থানায় ঢুকেছিস যে বড়, সাহস তো কম নয়! অ্যাঁ! কী চাই? কী চাই? কী মতলব? অ্যাঁ?"

বিষ্ণুরামের চেঁচামেচিতে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নরেন্দ্রনারায়ণ। একটু অবাক হয়ে বলল, "আজ্ঞে, আমরা একটু খোঁজখবর করতে এসেছি।"

বিষ্ণুরাম রিভলভার উঁচিয়ে বিকট গলায় বলে, "কীসের খোঁজ খবর, অ্যাঁ! কীসের খোঁজখবর? সোনার রেকাবি চাই? নাকি হিরের আংটি চাই? অ্যাঁ! মামাবাড়ির আবদার! ওসব এখানে নেই, বুঝলে! নেই! এখন বিদেয় হও তো দেখি! নইলে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব, এই বলে রাখলাম!"

নরেন্দ্রনারায়ণ আর তার সঙ্গী একটু মুখ-তাকাতাকি করে নিল। তারপর নরেন্দ্রনারায়ণ মুচকি একটু হেসে বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে নেই তো কী হয়েছে? অন্য কোথাও আছে হয়তো।"

বিষ্ণুরামের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মুখ লালবর্ণ ধারণ করল, সে গর্জন করতে গিয়ে দেখল গলা ফেঁসে ফ্যাঁস ফ্যাঁসে আওয়াজ বেরোচ্ছে। সে সেই গলাতেই বলল, "ভেবেছ আমার গিন্নির কাছে আছে? অ্যাঁ! আমার গিন্নির কাছে আছে? খবর্দার ওসব ভুলেও মনে এনো না। তা হলে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে। আমার গিন্নি মোটেই তিনটে সোনার রেকাবি দেড়শো টাকা দিয়ে কেনেনি, মোটেই একশো টাকা দিয়ে এক জোড়া হিরের আংটি কেনেনি। কী রে নবু, কিনেছে? বল না হেঁকে।"

নবু হাত কচলে বলল, "কী যে বলেন! গিন্নিমা কোত্থেকে কিনবেন? উনি তো তখন বাপের বাড়িতে।"

বিষ্ণুরাম রিভলভার আপসাতে আপসাতে বলল, "শুনলে তো!

ওসব জিনিস এখানে নেই। এবার তোমরা বিদেয় হও। ফের কোনওদিন থানার ত্রিসীমানায় দেখলে গুলি চালিয়ে দেব। বুঝলে?"

নরেন্দ্রনারায়ণ ঘাড় কাত করে বলল, "আজ্ঞে, বুঝেছি। কিন্তু জিনিসগুলো গেল কোথায় বলুন তো দারোগাবাবু! তিন তিনটে সোনার রেকাবি-র ওজন—"

বিষ্ণুরাম তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, "পঞ্চাশ ভরি, বলবে তো! ওসব চালাকি আমি জানি। হুঁ হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দ্যাখোনি। যতই চালাকি করে পেট থেকে কথা বের করার চেষ্টা করো না কেন, লাভ কিছু হবে না। তোমাদের মতো বদমাশ চরিয়েই আমি খাই। এখন মানে মানে বিদেয় হও।"

নরেন্দ্রনারায়ণ স্মিতহাস্য করে বলল, "আচ্ছা না হয় পঞ্চাশ ভরিই হল, তাতেই বা কী যায় আসে বলুন!"

বিষ্ণুরাম অগ্নিশর্মা হয়ে বলে, "সন্দেহ করছ বুঝি! ভেবেছ, কালোবরণ স্যাঁকরা মিথ্যে কথা বলে গেছে? দারোগার বাড়িতে এসে মিছে কথা কইবে, তার ঘাড়ে কটা মাথা? কথার প্যাঁচে ফেলে রেকাবির ওজন জেনে যাবে সেটি হবে না। বুঝলে!"

"আজ্ঞে, বুঝলাম।"

"কী বুঝলে?"

"বুঝলাম যে, আপনার গিন্নি মোটেই পঞ্চাশ ভরির তিনটে সোনার রেকাবি আর দুটো হিরের আংটি মোট আড়াইশো টাকায় কেনেননি। তিনি তখন বাপের বাড়িতে ছিলেন, আর কালোবরণ স্যাঁকরা মোটেই রেকাবির ওজন কমিয়ে বা বাড়িয়ে বলেনি। ঠিক তো?"

বিষ্ণুরাম রিভলভারটা ফের খাপে ভরে বলল, "হ্যাঁ। কথাটা মনে থাকে যেন! আমি ভাল থাকলে গঙ্গাজল, রাগলে মুচির কুকুর, বুঝেছ?"



"সে আর বুঝিনি! খুব বুঝেছি। তবে কী জানেন দারোগাবাবু, কেতুগড়ের রাজবাড়ি থেকে জিনিসগুলো যে সরিয়েছে সে সাধারণ চোর নয়। কোনও সিন্দুক বা লোহার আলমারিই তার কাছে কিছু নয়। তাই বলছিলাম, একটু সাবধান থাকবেন।"

"তার মানে?"

"আমাদের কাছে খবর আছে এদিক পানেই এসেছে চোর মশাই। অমন চোর লাখে একটা জন্মায়। আপনাকে একটু সাবধান করতেই আসা। আচ্ছা চলি। নমস্কার।"

লোকদুটো বিদেয় হওয়ার পর বিষ্ণুরাম ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে ফের রুমালে কপালের ঘাম মুছে বলে, "জোর বাঁচা গেছে। দেখলি তো নবু, লোকটাকে কেমন বোকা বানিয়ে ছাড়লাম। এসেছিল পেটের কথা টেনে বের করতে। কেমন ঘোলটা খাওয়ালাম বল।"

নবু বড় বড় দাঁত বের করে খুব হেসেটেসে বিগলিত হয়ে বলল, "তা আর দেখিনি! চোখের সামনে যেন আলিবাবা নাটক দেখছিলাম। একেবারে চিচিং ফাঁক। রেকাবি, আংটি আর আপনার আক্কেল সব যেন দাঁত কেলিয়ে বেরিয়ে পড়ল।"

বিষ্ণুরাম একগাল হেসে বলে, "তবেই বল।"

নবু মাথা নেড়ে বলল, "ওঃ, বুদ্ধিও বটে আপনার। যা কস্মিনকালেও বলার নয় তাও কেমন গড়গড় করে বলে দিলেন। থলি থেকে যেন ম্যাও বেরোল। লোকে কি আর সাধে আপনাকে অকাল কুষ্মাণ্ড বলে!"

বিষ্ণুরাম গর্জন করে উঠে বলে, "কার এত সাহস! কার এত বুকের পাটা?"

ভারী বিনয়ের সঙ্গে নবু বলল, "আদর করেই বলে, ভালবেসেই বলে। কুমড়ো কি আর খারাপ জিনিস বড়বাবু? ঘ্যাঁট বলুন, চচ্চড়ি

বলুন, ছোলা দিয়ে ছক্কা বলুন, পোড়ের ভাজা বলুন—কোনটা কুমড়ো ছাড়া চলে? এক ফোঁটা সর্ষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কুমড়ো সেদ্ধ খেয়ে দেখুন, অমৃত। ঘরে ঘরে কুমড়োর আদর।"

বিষ্ণুরাম স্তিমিত হয়ে বলল, "সত্যি বলছিস যে, আদর করে বলে।"

"আদর মানে! তারা তো আদরের চাদরে মুড়ে রেখেছে আপনাকে। আদর করে তারা যে আপনাকে গোবর গণেশ, সাক্ষীগোপাল, অকালষেঁড়েও বলে সে তো আর এমনি এমনি নয়। গুণের কদর করে বলেই বলে।"

"তুই কি বলতে চাস ওগুলোও ভাল ভাল কথা?"

"তা নয় তো কী! গোবর অতি পবিত্র জিনিস, সকাল বিকেল গোবর ছড়া না দিলে ঘরদোর শুদ্ধ হয় না। না হয় বাড়ির গিন্নিমাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন আর গণেশবাবার কথা কী আর বলব, সিদ্ধিদাতা স্বয়ং। তারপর ধরুন সাক্ষীগোপাল। কত বড় জাগ্রত দেবতা বলুন, এক জায়গায় বসে বসে গোটা দুনিয়ার লাগাম কষছেন। আর অকালষেঁড়ে? তাও ধরতে গেলে একটা ভাল কথাই। মানেটা আমার জানা নেই বটে, কিন্তু লোকে যখন আদর করে বলছে তখন খারাপ কিছু হবে না।"

"তুই যখন বলছিস তখন না হয় মেনে নিচ্ছি। কিন্তু কথাগুলোকে আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।"

গত সাত দিন ধরে বাঁশিটা নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে বটেশ্বর। কিন্তু ব্যাদড়া বাঁশি আজ অবধি একটা পোঁ শব্দ অবধি ছাড়েনি। বটেশ্বর যতবার ফুঁ দেয় ততবারই খানিক বাতাস দীর্ঘশ্বাসের শব্দ তুলে বেরিয়ে যায়। ভাগ্যিস রাতের দিকটায় দিঘির পাড়ে লোকজন থাকে না, তাই রক্ষে। নইলে তাকে নিয়ে হাসাহাসি হত।

আজও বাঁশি নিয়ে এসে ঘাটের পৈঠায় অন্ধকারে বসে আছে বটেশ্বর। চারদিকে অন্ধকার, তার মনে অন্ধকার, বাঁশিতে অন্ধকার। থোকা থোকা জোনাকি পোকা যেন অন্ধকারকে আরও নিরেট করে তুলেছে। ঘণ্টা খানেক বাঁশিতে আওয়াজ তোলার চেষ্টা করে এখন দমসম হয়ে পড়েছে সে।

পরশুদিন সে বাঁশি নিয়ে দুপুরবেলায় গোবিন্দপুরে ইরফান গাজির কাছে চুপিচুপি গিয়ে হাজির হয়েছিল। এই তল্লাটে ইরফানের মতো ওস্তাদ বাঁশুরিয়া আর নেই। তবে বুড়ো ভয়ংকর খিটখিটে আর বদমেজাজি। কেউ নাড়া বাঁধতে গেলে হাতের কাছে বদনা, গাড়ু, লাঠি যা পায় তাই নিয়ে তাড়া করে আর চেঁচায়, "বেরো! বেরো সুমুখ থেকে! দূর হয়ে যা বেসুরোর দল! পেটে সুরের স নেই, আম্বা আছে!" ভয়ের চোটে সাহস করে কেউ তার কাছে বড় একটা ঘেঁষে না। তবু প্রাণ হাতে করে বটেশ্বর গিয়েছিল। এই বাঁশিটা তাকে এমন হিপনোটাইজ করেছে যে, এখন সে সব কষ্ট স্বীকার করতে রাজি।

ইরফান গাজির চাকর বদরুদ্দিন আসলে চাকর নয়। সে বড়লোকের ছেলে। ইরফানের কাছে বাঁশি শিখবে বলে চাকর সেজে কাজে ঢুকেছে। ভোরবেলা যখন ইরফান রেওয়াজ করে তখন সে আড়াল থেকে যা পারে শিখে নেয়।

বদরুদ্দিনের কাছেই বটেশ্বর শুনেছে, ইরফানের মিষ্টি খাওয়া বারণ। ডাক্তার বলেছে, ইরফানের পক্ষে মিষ্টি বিষতুল্য। কিন্তু ওই মিষ্টিতেই ইরফান কাত। রসগোল্লা দেখলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বাড়ির লোকের সঙ্গে তার এই নিয়ে রোজ কাজিয়া হয়। অবশেষে বড় নাতনির শাসনে এখন ইরফান মিষ্টি খাওয়া ছেড়েছে। তবে নাতনির চোখের আড়ালে আবডালে লুকিয়েছাপিয়ে এক-আধটা খেয়ে ফেলে। বদরুদ্দিন বটেশ্বরকে বলল, "তুই দুপুরের দিকে যাস,

ওই সময়ে মেহেরুন্নেসা ইস্কুলে থাকে।”

ময়নাগড়ের বিখ্যাত ময়রা রামগোপাল ঘোষের এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে গিয়েছিল বটেশ্বর। বাঁশিটা পিছনে মালকোঁচার সঙ্গে গুঁজে নিয়েছিল। গিয়ে বাইরে থেকে “গাজিসাহেব! গাজিসাহেব!” বলে ডাকাডাকি করতেই ইরফান বেরিয়ে এল। সাদাদাড়িতে মেহেন্দির রং, পরনে সাদা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। চেহারাটা রোগা হলেও পোক্ত, চোখে শ্যেন দৃষ্টি। হেঁড়ে গলায় বলল, “কী চাই?”

“আজ্ঞে, এই একটু রসগোল্লা এনেছিলুম।”

ইরফানের রোখা ভাবটা একটু নরম হল, তবু তেজের গলায় বলল, “কে তুই? কী মতলব?”

“আজ্ঞে, আপনি গুণী মানুষ, তাই—”

“আমার গুণের তুই কী বুঝিস?”

তটস্থ বটেশ্বর বলে, “আমরা মুখ্যু মানুষ, কী বুঝব! লোকে বলে, তাই শুনেই জানি।”

“আমার যে রসগোল্লা খাওয়া বারণ তা জানিস না?”

একগাল হেসে বটেশ্বর বলল, “রসগোল্লা খাওয়া বারণ হবে কেন? আপনার তো মিষ্টি খাওয়া বারণ! তাই তো আমি রামগোপাল ঘোষের বিখ্যাত নোনতা রসগোল্লা অর্ডার দিয়ে বানিয়ে এনেছি। এতে মিষ্টির ম-টাও পাবেন না।”

ইরফান ঘোড়েল লোক। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে গলা তুলে বাড়ির লোক যাতে শুনতে পায় এমনভাবে বলল, “ও তাই বল। রামগোপালের সেই বিখ্যাত নমকিন রসগোল্লা তো! তা নিয়ে আয় তো, দেখি কেমন বানায়। খুব নাম শুনেছি বটে, এখনও চেখে দেখা হয়নি।”

চালাকিটা অবশ্য খাটল না। বাড়ির লোকেরা নোনতা রসগোল্লায় তেমন বিশ্বাসী নয়। তাই রসগোল্লার হাঁড়ি কেড়ে নিয়ে গেল।

ততক্ষণে অবশ্য ইরফান গোটাতিনেক টপাটপ মেরে দিয়ে বলছিল, "বাঃ বাঃ, নুন দিয়ে জারিয়েছে তো ভাল!"

রসগোল্লা নিয়ে বাড়িতে যে চেঁচামিচিটা হল সেটা একটু স্তিমিত হতেই বাঁশিটা বের করে ইরফানকে দেখাল বটেশ্বর, "ওস্তাদ, এ বাঁশিটায় শব্দ বের হয় না কেন বলবেন? বাঁশিটা কি খারাপ?"

ইরফান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বাঁশিটা দেখে বলল, "এটা কোথায় পেয়েছিস?"

'আজ্ঞে, একটা লোক একশো টাকায় বেচে দিয়ে গেছে।"

ভ্রূ কুঁচকে ইরফান বলল, "মোটে একশো? এর দাম তো লাখ টাকারও বেশি।"

"বলেন কী!"

ইরফান একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাঁশিটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "একে রসাভাস, দুইয়ে নিদ্রাপাশ, তিনে সর্বনাশ।"

"তার মানে?"

"যদি ভাল চাস তো ও বাঁশি কখনও বাজাসনে। ও হল মোহন রায়ের বাঁশি। কেতুগড় রাজবাড়ির জিনিস।"

"আপনি কি মোহন রায়কে চিনতেন?"

"তুই কি বুরবক? মোহন রায়ের এন্তেকাল হয়েছে একশো বছরেরও আগে।"

"এ বাঁশিতে তাহলে রহস্যটা কী?"

"তা আমি জানি না। এখন বিদেয় হ। আর মনে রাখিস ও বাঁশি বাজাতে নেই। যার কর্ম তারে সাজে, অন্যের হাতে লাঠি বাজে। যা, যা, বাঁশিটা বাঁশির জায়গামতো রেখে আয়।"

"আজ্ঞে ওস্তাদ, আপনি যদি একবার বাঁশিটা একটু বাজিয়ে শোনাতেন তা হলে ধন্য হতাম। শুনেছি বাঁশিটায় নাকি ভর হয়।"

ইরফান হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একটা সুপুরি কাটার

ভারী জাঁতি নিয়ে তাকে তাড়া করেছিল।

গাজিসাহেবের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি বটেশ্বর। শুধু এটুকু বুঝেছে যে, বাঁশিটা এলেবেলে বাঁশি নয়। কিন্তু লাখ টাকা দামের এই বাঁশির মহিমা কী। সেটাও বোঝা দরকার। বটেশ্বর ভারী বিভ্রান্ত বোধ করছে। আর ওই তিনটে কথারই বা মানে কী? একে রসাভাস, দুইয়ে নিদ্রাপাশ, তিনে সর্বনাশ!

অন্ধকারে কাছেপিঠে কোথাও একটা মৃদু গলা খাঁকারির শব্দ হল। সচকিত হয়ে বটেশ্বর বাঁশিটা তার জামার তলায় লুকিয়ে ফেলল। এ সময়ে এদিকপানে কারও আসার কথা নয়। তাই একটু উৎকর্ণ হল বটেশ্বর। অন্ধকারটা তার চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। আবছামতো সবই দেখতে পাচ্ছে সে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে কেউ ঘাপটি মেরে নজর রাখছে না তো!

বটেশ্বর টপ করে উঠে পড়ল। গাজিসাহেব বলেছিল বাঁশিটার দাম লাখ টাকা। হতেও পারে বা। সে চারদিকে নজর রাখতে রাখতে ঘাট ছেড়ে নির্জন পথ ধরে গাঁয়ের দিকে রওনা হল।

কিন্তু কয়েক কদম যেতে না যেতেই তার মনে হল কে বা কারা তার পিছু নিয়েছে। মনটায় বড় অস্বস্তি হচ্ছে তার। জায়গাটায় এত গাছগাছালি আর ঝোপঝাড় যে, কেউ লুকিয়ে পিছু নিলেও নজরে পড়া কঠিন। বটেশ্বর ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। আচমকাই একটা মস্ত লম্বা আর পেল্লায় চেহারার লোক অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

বটেশ্বর চেঁচাবে বলে সবে হাঁ করেছিল, কিন্তু গলায় স্বর ফোটার আগেই গদাম করে মুগুরের মতো একটা ঘুঁষি এসে তার মুখে পড়ল, আর সে চোখে অন্ধকার আর আলোর ফুলকি দেখতে দেখতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

পিছন থেকে লম্বাপানা ধুতি পাঞ্জাবি পরা আরও একটা লোক এগিয়ে এসে বটেশ্বরের মুখে জোরালো একটা টর্চের আলো ফেলে বিশাল চেহারার লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "তোকে দেখেছে?"

"দেখেছে।"

"তবে সাক্ষী রাখার দরকার নেই। গলার নলিটা কেটে দে।"

লোকটা নিচু হয়ে বটেশ্বরের শিথিল হাত থেকে গড়িয়ে পড়া বাঁশিটা তুলে নিয়ে রোগা লোকটার হাতে দিল। তারপর কোমর থেকে একটা ঝকঝকে ল্যাজা বের করে বটেশ্বরের গলা লক্ষ্য করে তুলল।

এখন হয়েছে কী, বটেশ্বরকে বিদেয় করার পর থেকে ইরফান গাজির মনটা খুঁতখুঁত করছিল। একটা আনাড়ির হাতে বাঁশিটা ছেড়ে দেওয়া কি উচিত কাজ হল। যদিও ওই বাঁশি বাজানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তবু কিছু বলাও যায় না। মোহন রায়ের ওই মোহন বাঁশি যে কার ফুঁয়ে বেজে উঠবে তা কে জানে!

খেয়েদেয়ে দুপুরে খাটিয়ার বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল ইরফান। কিন্তু কী যেন বড্ড কুটকুট করে কামড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ ঘুমোনোর চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে উঠে বসে ইরফান রাগারাগি করতে লাগল, "আমার বিছানায় যে ছারপোকা হয়েছে এটা কি কারও জানা নেই নাকি!"

তার বউ এসে বলল, "তোমার বিছানায় ছারপোকা! অবাক করলে যে! ওই বিছানা আমি নিজে রোজ রোদে দিই, ঝাড়ি।"

"তবে কামড়াচ্ছে কেন?"

ইরফানের বউ বিছানাটা তন্ন তন্ন করে উলটে পালটে দেখে বলে, "কোথায় ছারপোকা! পিঁপড়েও তো নেই। এ তোমার মনের বাতিক।"

ইরফান বোকা বনে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পর হঠাৎ বুঝতে পারল, তাকে যা কামড়াচ্ছে তা ছারপোকা বা পিঁপড়ে নয়। কামড়াচ্ছে তার বিবেক। আনাড়ির হাতে বিপজ্জনক বাঁশিটা ছেড়ে দেওয়া অবিবেচকের কাজ হয়েছে।

সুতরাং ইরফান উঠে পায়জামা কুর্তা পরে হাতে একটা খেঁটে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ময়নাগড় তাকে আরও একটা কারণে আকর্ষণ করছিল। বটেশ্বর যে অমৃত খাইয়ে গেছে সেই রামগোপালের রসগোল্লা আরও গোটাকতক খেতে না পারলে মনটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

ময়নাগড়ে পৌঁছে সে সোজা রামগোপাল ঘোষের দোকানে হাজির হয়ে হাঁক মারল, "কই হে রামগোপাল, দাও তো গোটাচারেক গরম গরম রসগোল্লা।"

রামগোপাল ইরফানকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, "মাপ করবেন গাজি সাহেব, ওটি পারব না। আপনার মিষ্টি খাওয়া বারণ আমি জানি, রসগোল্লা আপনার পক্ষে বিষতুল্য।"

ইরফান মিটমিট করে রামগোপালের দিকে খানিক চেয়ে থেকে একটু হেসে গলা নামিয়ে বলল, "আহা, না হয় রসটা নিংড়েই দাও না।"

"না গাজিসাহেব, তা হলে আমাকে নরকে যেতে হবে।"

ইরফান হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আর ক্ষুধার্তকে খাদ্য না দিলে বুঝি পাপ হয় না? তখন দোজখে যেতে হবে না?"

"খাবেন না কেন, অবশ্যই খাবেন। ভাল নিমকি আছে, ঘুঘনি আছে কচুরি আছে।"

"দুর, দুর! ওসব তো ইবলিশের খাদ্য। ভদ্রলোকের খাদ্য হল মেঠাই।"

"তা হলে গরম চপ আর মুড়ি!"

“না হে, উঠি। একটা মর্কটকে খুঁজে বের করতে হবে। তাড়া আছে।”

কিন্তু তাড়া থাকলেও তাড়াতাড়ি করার উপায় ছিল না। পথে তাকে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে নমস্কার জানায়, দু-চারটে কথাও কয়। এই করতে করতে দেরি হয়ে অন্ধকার নেমে পড়ল। বটেশ্বরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে তার বউ বলল, “দেখুন তো গাজিসাহেব, লোকটার যে কী হয়েছে, সর্বদাই অন্যমনস্ক থাকে। সন্ধের পর কোথায় যে যায় কে জানে। সেদিন আমাদের গয়লা রামবচন বলল, দিঘির পাড়ে খোঁটা-ওপড়ানো গোরু খুঁজতে গিয়ে নাকি ওকে দেখেছে একটা লাঠি হাতে নিয়ে বসে আছে।”

“দিঘি! সে তো গাঁয়ের বাইরে।”

“হ্যাঁ, সাপখোপ আছে, সন্ধের পর অন্য ভয়ও আছে, কিন্তু কথা মোটে কানে তোলে না।”

চিন্তিত ইরফান তাড়াতাড়ি হাঁটা দিল। লক্ষণ ভাল ঠেকছে না। ছোকরা বাঁশিটা বাজানোর তাল করছে।

তাড়াতাড়ি করেও দেরি হয়ে গেল ইরফানের। আরও একটু দেরি হলে অবশ্য আর বটেশ্বরকে পাওয়া যেত না।

অন্ধকার দিঘির ধারে দূর থেকে একটা হুটপাট এবং তারপর টর্চের আলো দেখে ইরফানের হঠাৎ মনে হল, একটা বিপদ ঘটছে। কেন মনে হল কে জানে। হঠাৎ খেঁটে লাঠিটা বাগিয়ে সে ছুটপায়ে গিয়ে আবছা অন্ধকারেও ল্যাজার ঝিলিকটা দেখতে পেল। বাঘের মতো লাফিয়ে চিন্তা ভাবনা না করেই সে খেঁটে লাঠিটা লোকটার কোমরে সপাটে বসিয়ে দিল।

লোকটা ‘বাপ রে’ বলে লাফিয়ে উঠতেই আরও এক ঘা। ল্যাজাটা ছিটকে পড়ল হাত থেকে। লোকটা চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল। সঙ্গে আরও একটা লোকও দৌড়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

ইরফান বটেশ্বরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আপনমনেই বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "আহাম্মক কোথাকার, বাঁশির জন্য প্রাণটাই যে যাচ্ছিল তোর!"

দিঘি থেকে এক আঁজলা জল তুলে এনে মুখে ঝটকা দিতেই উঠে বসল বটেশ্বর। তারপর ডুকরে উঠে বলল, "গাজিসাহেব, বাঁশিটা যে নিয়ে গেল।"

"তোকে বলেছিলুম কি না, জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে আয়!"

"কিন্তু এখন কী হবে?"

"সর্বনাশ করে বসে আছিস। শয়তানদের হাতে পড়লে এ-জায়গা শ্মশান করে ছেড়ে দেবে। এখন ওঠ বাপু, ঘরে যা, প্রাণে যে বেঁচে আছিস সেই ঢের। আমারও কাজ বাড়ালি।"

"আপনি বুড়ো মানুষ, কী করবেন?"

ইরফান খিঁচিয়ে উঠে বলে, "বুড়ো মানুষের লাঠির জোর ছিল বলেই তো বেঁচে গেলি।"

কাপড়ের খুঁটে নাকটা চেপে ধরে বটেশ্বর বলল, "তা ঠিক। তবে কিনা বারবার কি ওরকম হবে? তার চেয়ে গাঁয়ের লোকদের জানাই চলুন।"

"অতি সন্নিসিতে যে গাজন নষ্ট।"

"না গাজিসাহেব, আপনি একলা অত সাহস করবেন না। যে লোকটা আমাকে মেরেছে তার বিশাল চেহারা, গায়ে পেল্লায় জোর।"

ইরফান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তাই করি চল। গাঁয়ের লোকদেরই জানাই।"

ঘণ্টাখানেক বাদে হাটখোলার মাঠে মেলা লোক জড়ো হয়েছে। দশ-বারোটা হ্যাজাক জ্বলছে। মাইকে দাঁড়িয়ে সত্যগোপাল কম্বুকণ্ঠে

ভাষণ দিচ্ছিল, "ভাইসব, ময়নাগড় আর সেই ময়নাগড় নেই। এই ময়নাগড়কে নিয়েই কবি গান বেঁধেছিলেন, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি। এখানে গাছে গাছে মলয় পবনের মর্মরধ্বনি, নদীর কুলু কুলু তান, কোকিলের কুহু কুহু গান শোনা যেত। খেতে ধান, গোয়ালে গোরু, মুখে হাসি, এই ছিল ময়নাগড়ের চিরপরিচিত দৃশ্য। আজ সেই সোনার ময়নাগড় সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিষ্ণুরামদারোগা উঠে বজ্রকণ্ঠে বলল, "এই যে আজ সমাজবিরোধীর ঘুসিতে বটেশ্বরের নাক কেটে রক্ত পড়েছে, বীরের এই রক্তস্রোত, মাতার এই অশ্রুধারা, এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা? আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া। প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস, লেখা হয় যেন আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ। ভাইসব, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভাল? বলুন আপনারা, এই দেশের জন্যই কি শহিদ ক্ষুদিরাম, শহিদ ভগৎ সিং, শহিদ গোষ্ঠ পাল প্রাণ দিয়ে গেছেন?"

কানের ব্যথা নিয়ে সভায় এসেছিল কালীপদ। খানিক বাদে নড়েচড়ে বসে পাশে-বসা হাঁদু মল্লিককে বলল, "বুঝলে হাঁদুদা, কানের কটকটানিটা সেরে গিয়ে এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। বিষ্ণুরামদারোগা কেমন সত্যগোপালকে টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেল দেখলে?"

হাঁদু মুখ শুকনো করে বলে, "সে না হয় হল। কিন্তু গঞ্জে সমাজবিরোধীরা আনাগোনা করছে, এ তো ভাল কথা নয় রে ভাই। দুটো পয়সা নাড়াচাড়া করতে হয়, পয়সা ছাড়া গরিবের আর

আছেটাই-বা কী বলো! তাতেও তো দেখছি শনি এসে ঢুকল। এরকম হলে কাজ কারবার তুলে দিয়ে যে আমাকে কাশীবাসী হতে হবে।"

পিছন থেকে রাখাল বলল, "আহা, কাশীটাই বা কী এমন সুখের জায়গা বলো। এই তো হরেন ব্রহ্ম কাশীতে তীর্থ করতে গিয়ে বাটপাড়ের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে এসেছে। তবু যদি যেতে হয় এক বস্ত্রে যেও। তোমার কারবার আমিই দেখেশুনে রাখব 'খন।"

বিশু একটা তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করে বলল, "ছোঃ, যে ছত্রিশের কত নামে আর কত হাতে থাকে তাই জানে না সে আবার কারবারি!"

আর একটু হলেই হাঁদুর সঙ্গে বিশুর হাতাহাতি লেগে যাচ্ছিল, এমন সময় হেডস্যার পান্নালালবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বেঁটে তলোয়ারের মতো ঝকঝকে ল্যাজাটা তুলে ধরে জনসাধারণকে দেখিয়ে বললেন, "ভাইসব, এই সেই ল্যাজা। এই ল্যাজা দিয়েই দুষ্কৃতী বটেশ্বরের মুড়ো কাটতে চেয়েছিল। ল্যাজা দিয়ে মুড়ো কাটার এই অপচেষ্টা গাজিসাহেবের বীরত্বে ব্যর্থ হয়েছে বটে, কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, এই অপচেষ্টা আবার হবে। ল্যাজা দিয়ে মুড়ো কাটার এই অপসংস্কৃতি ময়নাগড় থেকে দূর করতেই হবে, নইলে আমাদের শান্তি নেই। বন্ধুগণ, আজ হাজার কণ্ঠে আপনারা আওয়াজ তুলুন, ল্যাজা দিয়ে মুড়ো কাটা চলবে না, চলবে না ..."

সঙ্গে সঙ্গে জনতা গর্জন করে উঠল, "চলবে না, চলবে না।"

এর পর উঠল ইরফান গাজি। সে বলল, "ভাইসব, আমি কথাটথা বিশেষ কইতে পারি না। বক্তৃতা দিতে জানি না। শুধু বলি, সামনে ঘোর বিপদ। সব কথা প্রকাশ্যে ভেঙে বলা যাবে না। শুধু বলি, মোহন রায়ের বাঁশি যদি বদমাশদের হাতে পড়ে থাকে তা হলে এটা ভূতপ্রেতের রাজ্য হয়ে যাবে। তাই এখনই বদমাশ দুটোকে ধরতে হবে। নইলে রক্ষে নেই।"

ভিড়ের পিছনে, একটু দূরে, অন্ধকারে দুই মূর্তি পাশাপাশি বসা।

পরাণ মৃদুস্বরে বলল, "ওস্তাদজি, গাজিসাহেব যা বলল তা কি সত্যি?"

শ্রীনিবাস মাথা নেড়ে বলে, "সেরকমই তো জানি। তবে সত্যি-মিথ্যে যাচাই তো হয়নি। কেতুগড় রাজবাড়ির মহাফেজখানার পুঁথিপত্রে সেরকমই লেখা আছে।"

"মোহন রায়টা কে বলুন তো?"

"দেড়শো বছর আগে রাজা শশাঙ্কনারায়ণের সভায় বাঁশি বাজাত, গুণী মানুষ।"

"আর একটু ভেঙে বললে হয় না ওস্তাদ?"

"সব কথা একবারে শুনলে তোর মাথায় জট পাকিয়ে যাবে। অল্প অল্প করে শোনাই তো ভাল। তোর মাথায় যে গোবর সেটা কি ভুলে গেলি?"

"আপনার কাছে ক'দিন তালিম নিয়ে মাথাটা একটু খোলসা হয়েছে কিন্তু।"

"বটে! কীরকম?"

"এই ধরুন আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, বাঁশিটার মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্রের একটা ব্যাপার আছে। বাঁশিটা বাজলে হয়তো ঘূর্ণি ঝড় উঠবে বা নদীতে বান আসবে বা ভূমিকম্প গোছের কিছু হবে।"

"বাপ রে! তোর তো দেখছি গুরুমারা বিদ্যে!"

"ঠিক বলিনি?"

"অনেকটাই বলেছিস বাপু। আর বলতে কী, কিছু খারাপও বলিসনি।"

"তবেই বুঝুন, আমার মাথায় সবটুকুই গোবর নয়। আগে আমি নিজের মাথা থেকে একটা গোবর-গোবর গন্ধও পেতুম। আজকাল কিন্তু পাচ্ছি না।"

"বোধহয় গোবরের রস মরে ঘুঁটে হয়েছে। তবু বলি আন্দাজ করেছিস মন্দ নয়।"

"এবার তা হলে ভেঙে বলুন।"

"ভেঙে বলিই বা কী করে? মোহন রায় তো খোলসা করে সব লিখে যায়নি। সাঁটে লিখে গেছে। একে রসাভাস, দুইয়ে নিদ্রাপাশ, তিনে সর্বনাশ।"

"এ যে আরও গুবলেট হয়ে গেল ওস্তাদ। বুদ্ধিটা সবে ঘুম ভেঙে হাই তুলছে। এখনও আড় ভাঙেনি। এখনই কি আর অত শক্ত শক্ত অঙ্ক পারব?"

"অঙ্ক তো আমার নয় রে, মোহন রায়ের। তবে বাঁশিটার নীচের দিকে তিনটে ছ্যাঁদা আছে। তিনটেই ছিপি দিয়ে আঁট করে বন্ধ। প্রথম ছিপিটা খুলে দিলে বাঁশির সুরে চারদিকে আনন্দের লহরী বইবে। লোকে সেই সুরে মাতাল হয়ে বুঁদ হয়ে থাকবে। যদি প্রথম ছ্যাঁদা বন্ধ রেখে দু'নম্বর ছ্যাঁদার ছিপি খোলা যায় তা হলে ওই নিদ্রাপাশ। মানে যতদূর বাঁশির শব্দ যাবে ততদূর মানুষজন পশুপাখি সব ঢলাঢল ঘুমিয়ে পড়বে। পাশ মানে জানিস?"

"আজ্ঞে, কথাটা শোনা শোনা ঠেকছে। এই যেমন আপনি আমার পাশে, সেই পাশ কি?"

"আরও একটু গভীর। পাশ মানে বন্ধন। নিদ্রাপাশ মানে ঘুমের বন্ধন। খুব আঁট করে ঘুমের দড়িতে সবাই বাঁধা পড়বে। বুঝলি?"

"এ তো বড় ভাল জিনিস ওস্তাদ। সবাইকে যদি ঘুম পাড়িয়ে ফেলা যায় তা হলে তো আমাদের একেবারে খোলা মাঠ। চেঁছেপুঁছে আনা যাবে। এক রাতেই রাজা।"

"অত লাফাসনি। যারা বাঁশি কেড়ে নিয়ে গেছে তারাও ওই মতলবেই নিয়েছে।"

"আর তিন নম্বর ছ্যাঁদা?"

"সেটা ওই তুই যা বললি। ঘূর্ণি ঝড় বা বান বা ভূমিকম্প। সাঁটেও তাই বলা আছে। তিনে সর্বনাশ। তাই যার-তার হাতে ও জিনিস গেলে বড় বিপদের কথা।"

"তা হলে আমরা আর দেরি করছি কেন ওস্তাদ?"

"তুই এক্ষুনি তেড়েফুঁড়ে উঠে একটা কিছু করতে চাস বুঝতে পারছি। কিন্তু মনে রাখিস সবুরে মেওয়া ফলে। বাঁশিচোর কি তোর হাতে ধরা দেবে বলে দু'হাত বাড়িয়ে বসে আছে? তার ওপর ভেবে দ্যাখ, সেই গুণ্ডাটা যদি চড়াও হয় তা হলে এই ল্যাকপ্যাকে শরীর নিয়ে লড়াই দিতে পারবি কি না।"

উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়ল পরাণ। বলল, " যতই যাই করতে যাই আপনি কেন যে তাতে জল ঢেলে দেন কে জানে।"

"হুটপাট করে কাজ পণ্ড করার চেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করা ভাল। কাজের পিছনে চিন্তা হল ছেলের পিছনে মা।"

একগাল হেসে পরাণ বলল, "এবার বুঝেছি। যেমন ডালের পিছনে শুকতো, দুইয়ের পিছনে এক, হাতের পিছনে বগল, রামের পিছনে রামায়ণ, মুর্গির পিছনে ডিম, সওদার পিছনে পয়সা, কাশীর পিছনে গয়া, দইয়ের পিছনে দুধ, ঢেঁকুরের পিছনে ভোজ....।"

"ওরে ক্ষ্যামা দে। যথেষ্ট হয়েছে। জলের মতো বুঝেছিস।"

"বলছিলুম না আপনাকে, মাথা থেকে গোবরের গন্ধটা গায়েব হয়েছে!"

"তা তো হয়েছে, এখন বল তো, পিছনে ওই কাঁঠালতলায় ঘাপটি মেরে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে আছে, ওই লোকটা কে!"

পরাণ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, "কোথায় কে? জোনাকি পোকা ছাড়া আর তো কিছু দেখা যাচ্ছে না ওস্তাদ!"

"তুই কি বলতে চাস, আমি ভুল দেখছি? বারবারই আমার চোখ চলে যাচ্ছে ওইদিকে। ওই দ্যাখ না, একটা সাদাটে জোব্বামতো পরা...

ওই যে এইমাত্র উঠে দাঁড়াল, দেখেছিস?"

পরাণ ফের ঘাড় ঘুরিয়ে ভাল করে দেখে বলল, "আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না ওস্তাদ!"

শ্রীনিবাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "চলে গেল!"

পরাণ চিন্তিত হয়ে বলল, "ওস্তাদ, চোখে ছানিটানি পড়েনি তো! ছানি হয়ে থাকলে তো খুবই দুশ্চিন্তার কথা। কাজ-কারবার হবে কী করে?"

শ্রীনিবাস গম্ভীর মুখে বলে, "ছানি নয় রে, দূরদৃষ্টি, যা দেখেছি ঠিকই দেখেছি। ও জিনিস তোর দেখার নয়। দেখতে যে পাসনি তাতে ভালই হয়েছে।"

শশব্যস্তে পরাণ বলল, 'জিনিসটা কী ওস্তাদ? সেই জিনিস নাকি, সন্ধের পর যার নাম করতে নেই? রাম রাম রাম রাম..."

"কিছু একটা হবে। এখন বাড়ি চল তো। বউমাকে আজ লাউ-পোস্ত রাঁধতে বলে এসেছি। বুড়ো বয়সে আমার একটু নোলা হয়েছে। ভিতরটা কেবল খাই খাই করে।"

"আজ্ঞে, সে আমারও করে।"

'কিন্তু তা বলে ঠেসে খাসনে। আজ রাতে একটু কাজে বেরোতে হবে। কাজের সবচেয়ে বড় শত্রু হল খাওয়া। বুঝেছিস?"

"তা আর বুঝিনি! চোরের শত্রু পুলিশ, ওলের শত্রু তেতুঁল, জোঁকের শত্রু নুন, ধারের শত্রু সুদ, কালীর শত্রু কেষ্টঠাকুর, বরের শত্রু বউ, খিদের শত্রু ভাত....।"

"বুঝেছি; বুঝেছি! এখন পা চালিয়ে চল তো।"

"যে আজ্ঞে।"



সভায় সিদ্ধান্ত হল গাঁয়ের লোকেরা চার-পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে চারদিকে লোক দুটোকে খুঁজে বেড়াবে। সেইসঙ্গে সারা রাত গাঁ পাহারাও দেবে। এসব কাজে সত্যগোপাল সর্বদাই নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। কে কোন দলে থাকবে তাও সে ঠিক করে দিল। তাই নিয়ে অবশ্য খানিক গণ্ডগোল হল। যেমন ছকু দাসের সঙ্গে কালীপদর ঝগড়া, তাই কালীপদ ছকুর দলে যেতে নারাজ। মনোরঞ্জন কম্পাউন্ডারের গোরুকে বিশু পাল খোঁয়াড়ে দিয়েছিল বলে মনোরঞ্জন বিশু পালের দলে যেতে রাজি নয়। তার বাবার অসুখ হওয়ায় হারাধন প্রভঞ্জন ডাক্তারকে ডাকতে গিয়েছিল, কিন্তু প্রভঞ্জন তবু তাকে ইনজেকশন দিয়েছিল বলে হারাধনের রাগ এখনও যায়নি, তাই ডাক্তারবাবুর দলে সে গেল না। ইত্যাদি।

বিষ্ণুরাম বলল, "দেখুন, আমিই হলাম এখানে সরকারের প্রতিনিধি। আইন শৃঙ্খলার কর্তা, সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমিই ময়নাগড়ের সরকার। আমার ওপর বিরাট দায়িত্ব। আমি আক্রান্ত হওয়া মানে সরকার আক্রান্ত হওয়া। আমার পতনের মানে সরকারের পতন। আমার ধরাশায়ী হওয়া মানে সরকারের ধরাশায়ী হওয়া। সুতরাং আমাকে খাড়া থাকতে হবে। সুস্থ ও নিরাপদ থাকতে হবে। আমার ভাল থাকা মানে সরকারের ভাল থাকা। তাই আমি বাড়ি যাচ্ছি। কোনও বিপদ ঘটলে আপনারা সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। জানবেন, আমি অর্থাৎ সরকার আপনাদের পিছনেই আছি।" ইত্যাদি।

হ্যাজাক, লণ্ঠন, টর্চ ইত্যাদি নিয়ে দলে দলে লোক বেরিয়ে পড়ল। কারও হাতে লাঠি, কারও বা দা, কারও হাতে কুড়ুল বা শাবল। যে যা অস্ত্র পেয়েছে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। পঞ্চাননের হাতে ঝাঁটা দেখে গঙ্গারাম প্রশ্ন তোলায় পঞ্চানন বলল, "ঝাঁটাটাকে তুচ্ছ ভেবো না ভাই, আমার গিন্নির হাতে এই ঝাঁটার কেরামতি তো দ্যাখোনি। আমার বিশ্বাস ঝাঁটা দিয়ে সে বাঘও মারতে পারে।"

গঙ্গারাম রায়ের বাড়ির দাওয়ায় দুটো লোক মাদুর পেতে ঘুমোচ্ছিল। বিশু পালের দল তাদের দেখতে পেয়েই পা টিপে টিপে গিয়ে ঘিরে ফেলল। টর্চ ফোকাস করে দেখা গেল, তারা কেউ গাঁয়ের চেনা লোক নয়। সঙ্গে সঙ্গে বিশুর দল লাঠিসোঁটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। লোক দুটো আচমকা হামলায় উঠে হাউরেমাউরে চিৎকার।

গঙ্গারাম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলল, "করো কী, করো কী তোমরা! ওঁরা যে আমার পিসেমশাই আর মেসোমশাই! বুড়ো মানুষ ঘরে গরম হচ্ছিল বলে বারান্দায় শুয়েছেন।"

বিশু পাল অপ্রস্তুত হলেও মারমুখো ভাবটা বজায় রেখেই বলল, "পিসেমশাই আর মেসোমশাই বললেই তো হবে না। প্রমাণ কী?"

এই সময়ে গঙ্গারামের পিসি আর মাসি একজন হাতে রুটি বেলার বেলুন, আর একজন ঘাস কাটার হেঁসো নিয়ে বেরিয়ে এসে সপ্তমস্বরে চেঁচাতে লাগল, "প্রমাণ! দেখাচ্ছি তোমার প্রমাণ! হতভাগা, বোম্বেটে, গুণ্ডা, আজ তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন...।"

অগত্যা বিশু পাল আর তার দলবলকে পিছু হটতে হল।

নয়নচাঁদের বারান্দায় একটা লোক বসে বসে গুনগুন করে রামপ্রসাদী ভাঁজছিল। রাখাল মোদকের দল গিয়ে যখন তাকে পেড়ে ফেলল তখন লোকটা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "আমি যে নয়নবাবুর

মেজোজামাই। গোবিন্দপুরে বিরিঞ্চি মহাজনের গদিতে বিষয়কর্মে আসা। ফিরতে রাত হয়ে গেল বলে শ্বশুরবাড়িতে রাতটা কাটাতে এসেছি। এসে দেখি ঘর তালাবন্ধ। বাড়িসুদ্ধু লোক নাকি পাশের গাঁয়ে যাত্রা শুনতে গেছে। তাই বসে আছি মশাইরা, আমি চোর-ডাকাত নই।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা, সবাই এই মারে, কি সেই মারে।

লোকটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "গণ্ডগ্রামের কথা শুনেছি মশাই, কিন্তু গুণ্ডাগ্রামের কথা জানা ছিল না। এই নাক মলছি, কান মলছি, জীবনে আর কখনও শ্বশুরবাড়িমুখো হব না।"

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ি থেকে পাঁচকড়ি নস্কর বেরিয়ে এসে বলল, "তোমাদের আক্কেলখানা কী হে, এই তো সেদিন নয়নচাঁদের মেজো মেয়ের বিয়েতে এসে তোমরা গাঁসুদ্ধু লোক গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে গেলে। ওই রাখাল বিশ্বাস বাইশখানা মাছ খেয়েছে, এই কালীপদ সেদিন একান্নটা রসগোল্লা সাঁটিয়েছিল, আর ওই যে সত্যগোপালের চেলা প্যাংলাচরণ এখন মুখ লুকোচ্ছে, ওটি অন্তত সেরটাক খাসির মাংস গিলেছিল। যার বিয়ের ভোজে কাছা খুলে খেয়েছিলে আজ তাকে দেখেও চিনতে পারছ না, নেমকহারাম আর কাকে বলে!"

রাখাল মোদক আমতা আমতা করে বলল, "জানোই তো ভাই, আমি বোকাসোকা মানুষ। একটা ভুল হয়েছে, মাপ করে দাও।"

পাঁচকড়ি হেঁকে বলল, "যে গাঁয়ে জামাইয়ের হেনস্থা হয় সে গাঁয়ে আর কোনও জামাই আসতে চাইবে? এ যা করলে তোমরা, এরপরে এ গাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করতেও আর কোনও জামাই বাবাজীবনের আগমন ঘটবে না। কী সর্বনাশটা হবে একবার ভেবে দেখো। ঘরে ঘরে আইবুড়ো মেয়েরা বসে বসে বুড়ি হয়ে যাবে।"

ভয় পেয়ে সবাই মিলে নয়নচাঁদের জামাইকে তাড়াতাড়ি খুব



খাতিরটাতির করে রাখালের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভোজের আয়োজন করে ফেলল। নরম বিছানাটিছানা পেতে দিল।

ভজুরাম আর গজুরাম নয়াগঞ্জের মাড়োয়াড়ি মহাজনের পাইক। তিন গাঁ ঘুরে তাগাদা সেরে রাতের দিকে ময়নাগড়ের বাঁশবনের পাশ ঘেঁষেই দুই পালোয়ান ফিরছিল। এমন সময় 'রে রে' করে ডাক্তার প্রভঞ্জনের দলবল তাদের ওপর গিয়ে চড়াও হল। ব্রজ কবরেজ চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই দুজনই তো! ঠিক চিনেছি।" হোমিও নগেনও দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "হুবহু সেই মুখ, সেই চোখ।"

সবাই মার-মার করে যখন ঘিরে ফেলল তাদের তখন দু'জনে খানিক অবাক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল। ভজুরাম বলল, "এ হো গজুয়া, ইন লোক ক্যা কহতানি রে?"

"মালুম নেহি ভাই। এক এক কো উঠাকে পটক দে।"

প্রভঞ্জন দু'জনের রোখাভাব আর বিশাল চেহারা দেখে গম্ভীর গলায় বলল, "না, না, এরা নয়। তোমাদের ভুল হয়েছে।"

ব্রজ কোবরেজও সায় দিল, "না, এরা তো তেমন খারাপ লোক বলে মনে হচ্ছে না। হ্যারিকেনের আলোতে ভাল বোঝা যাচ্ছিল না বটে।"

নগেন মিনমিন করে বলল, "আমিও তো পইপই করে বলেছিলাম এরা হতেই পারে না। তারা ছিল অন্যরকম লোক।"

ভজুরাম আর গজুরাম হেলতে দুলতে চলে গেল।

কাঁঠালতলার ভূতটাকে দেখার পর থেকেই শ্রীনিবাস একটু গুম মেরে গেছে। ওস্তাদের মুখচোখের ভাব দেখে পরাণ তাকে বেশি ঘাঁটাচ্ছে না। ওস্তাদ মানুষেরা যখন চুপ মেরে থাকে তখন তাদের মাথায় নানা ভাল ভাল মতলবের খেলা চলতে থাকে। অনেকটা রান্নাবান্নার মতোই। গরম তেলে ফোড়ন পড়ল, মশলা পড়ল,

তারপর ব্যাঞ্জন কি মাছ কি মাংস জারানো হতে লাগল। সব মিলে মিশে যে জিনিসটা বেরিয়ে এল সেটাই আসল।

ওস্তাদের সঙ্গে কয়েকদিন থেকে পরাণ নিজের খামতিগুলো আরও বেশি টের পাচ্ছে। এই যে ওস্তাদ কাঁঠালতলায় ভূতটাকে দেখতে পেল, কিন্তু সে পেল না। তার মানে পরাণের চোখ এখনও তৈরি হয়নি। তৃতীয় নয়ন না থাকলে হবেই বা কী করে? রাতবিরেতে সে তো আলায়-বালায় ঘোরে, ভূতবাবাজিরা কি আর তখন হাঁটাহাঁটি করে না? কিন্তু ওই তিন নম্বর চোখটার অভাবে আজ অবধি তাদের কারও দেখাই পেল না সে। তার যা কাজ তাতে এক-আধজন ভূতপ্রেত হাতে থাকলে সুলুক সন্ধান পেতেও সুবিধে হয়।

নিজের অযোগ্যতার জন্য ভারী মনমরা হয়ে থাকতে হয় পরাণকে। নয়নতারার গঞ্জনায় জীবন আরও অতিষ্ঠ। তার কপালদোষে নয়নতারা আবার ষষ্ঠী গুণের মেয়ে। সেই ষষ্ঠী গুণ, ঝিকুড়গাছার আশপাশের দশটা গাঁয়ের চোর-বাটপাড়েরা যার নাম শুনলে হাতজোড় করে কপালে ঠেকায়, গুণীর মেয়ে তো, তাই তাকে চোর বলেই গণ্য করে না। কথা উঠলে বলে, "তুমি তো এখনও চুরিতে হামাদেওয়া শিশু।"

ষষ্ঠী গুণের মেয়ের কাছে নিত্যি হেনস্তা হতে হচ্ছে বলে একদিন সে নিজের বাজারদরটা যাচাই করতে পুলিশের ইনফর্মার নবুদাদার কাছে গিয়েছিল। পরগনার সমস্ত চোরছ্যাঁচড়ার খবর নবুদাদার নখদর্পণে। গিয়ে পেন্নাম করে বলল, "নবুদাদা, পুলিশের খাতায় কি আমার নামে খারাপ কিছু লেখা আছে? মানে কেউ নালিশটালিশ কিছু করে রেখেছে কি না তাই জানতেই আসা।"

নবু ভারী অবাক হয়ে বলল, "কেন রে, তোর নামে নালিশ করবে কেন? কী করেছিস তুই?"

ঘাড়টাড় চুলকে ভারী লজ্জার সঙ্গে পরাণ বলল, "ওই রাতবিরেতে কাজকর্ম আর কী?"

নবু আরও অবাক হয়ে বলে, "চোর নাকি তুই!"

"যে আজ্ঞে।"

"নামটা বল তো, লিস্টিটা দেখি।"

"আজ্ঞে পরাণ দাস।"

নবু একখানা লম্বা খাতা বের করে ভ্রূ কুঁচকে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, "বদন মণ্ডল, পাঁচু গড়াই, গেনু হালদার, খগেন দুলে... দাঁড়া প-এর পাতাটা দেখি। এই তো পবন সাঁতরা, পতিতপাবন কোঙার, পীতাম্বর দাস... নাঃ, পরাণ দাসের নাম তো নেই।"

ভারী হতাশ হয়ে পরাণ বলল, "নেই?"

"না। চুরি করিস অথচ আমার খাতায় নাম ওঠেনি এ আবার কেমন ব্যাপার! তা কী চুরি করিস বল তো! বড় কাজটাজ কিছু করেছিস?"

পরাণ ভারী লাজুক মুখে ঘাড় হেঁট করে বলল, "নিজের মুখে কী আর বলব। গত মাসে রায়বাড়ি থেকে কিছু বাসনপত্র সরিয়েছিলাম, সপ্তাহ দুয়েক আগে ঘোষবাড়িতে সিঁদ দিয়ে চারখানা শাড়ি, তিনটে ধুতি আর একটা পেতলের গামলা পাই। গেল হপ্তায় মদন ময়রার দোকানে ক্যাশবাক্স ভেঙে তিপ্পান্ন টাকা ষাট পয়সা আর দু'হাঁড়ি দই রোজগার হয়। দিন তিনেক আগে—"

নবু নাক সিঁটকে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তাই বল! তুই এখনও শিক্ষানবিশ! সেইজন্যই আমার লিস্টিতে নাম ওঠেনি। তার জন্য মন খারাপ করিসনি, মন দিয়ে কাজ কর। নিষ্ঠা থাকলে, পরিশ্রম করলে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকলে একদিন উন্নতি হবেই, দেখে নিস। চরিত্র চাই রে, চরিত্র চাই। মনটাকে শক্ত করে লেগে যা।"

নবুদাদার কাছে ও কথা শোনার পর মরমে মরে ছিল পরাণ। এখন শ্রীনিবাস চূড়ামণির দেখা পাওয়ার পর মেঘলা আকাশে যেন সূর্যের মুখ উঁকিঝুঁকি মারছে। আবার গগনে যেন সুধাংশু উদয় রে।

মিটিং ভেঙে গেছে অনেকক্ষণ। গাঁয়ের লোকেরা সব লাঠিসোঁটা নিয়ে গ্রাম টহল দিতে বেরিয়ে পড়েছে। অন্ধকার মাঠের একটা কোণে তবু গুম হয়ে বসে আছে শ্রীনিবাস চূড়ামণি। পাশে বশংবদ পরাণ। বারকয়েক ডেকেও সাড়া না পাওয়ায় পরাণও এখন চুপ মেরে গেছে। মাঝে-মাঝে শুধু চটাস-পটাস করে মশা মারছে। সে বুঝতে পারছে চূড়ামণির এখন ধ্যানস্থ অবস্থা। এই ধ্যানটা অনেকটা ডিমে তা দেওয়ার মতো। তারপর একসময়ে ধ্যানের ডিমটা ফেটে ফন্দিফিকির পিল পিল করে বেরিয়ে আসবে।

বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকার পর শ্রীনিবাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "চল।"

"যে আজ্ঞে!" বলে উঠে পড়ল পরাণ, হ্যাঁ, এইবার ডিম ফেটেছে বলেই মনে হচ্ছে। সে সোৎসাহে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যেতে হবে ওস্তাদ?"

"কেন, তোর বাড়িতে! গরম ভাতে একটু কাঁচালঙ্কা ডলে লাউপোস্ত খেয়েছিস কখনও? ওরে, সে জিনিস মুখে দিলে মনে হবে অমরাবতীতে পৌঁছে গেছি।"

পরাণের মুখ শুকিয়ে গেল। সে একটা ঢোঁক গিলে বলল, "আপনি কি এতক্ষণ গুম হয়ে বসে লাউপোস্তর কথা ভাবছিলেন নাকি?"

"তা ছাড়া আর ভাববার আছেটা কী?"

"কিন্তু বাঁশিটা যে বদমাশদের হাতে গিয়ে পড়ল তার কী হবে? তারা যে পগার পার হয়ে গেল এতক্ষণ!"

"আহা, গুণ্ডা-বদমাশরা দূরে থাকলেই তো ভাল। তাদের সঙ্গে

গা ঘষাঘষি করার দরকারটা কী আমাদের?"

পরাণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "কিন্তু ওস্তাদ, বাঁশিটা হাতছাড়া হলে আমাদের আর রইলটা কী? বড্ড আশায় আশায় ছিলাম, বাঁশিটা পেলে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে নিশ্চিন্তে কাজকারবার বাগিয়ে নেব। বেশি কিছু নয় ওস্তাদ, একখানা পাকা দোতলা বাড়ি, পনের-বিশ বিঘে ধানী জমি, দুটো দুধেল গাই, বউয়ের গায়ে দু-চারখানা সোনার গয়না, আর ধরুন আমার একখানা আলপাকার কোট আর সাহেবি টুপির বড় শখ। দজ্জাল বউটার মুখের মতো একখানা জবাব দিতে পারতুম তা হলে। মুখনাড়া দিতে এলেই এক বান্ডিল নোট ছুঁড়ে দিতুম পায়ের কাছে, তা হলেই মুখে কুলুপ। তা সেই আশায় কি লাল সিগন্যাল পড়ে গেল ওস্তাদ? লেভেল ক্রসিং-এর গেট কি বন্ধ হয়ে গেল? নটী বিনোদিনীর পার্ট করতে করতে কি হিরোইনের বাঁধানো দাঁত খসে পড়ে গেল? নাকি শ্রীরাধিকার অভিসারের পথে আয়ান ঘোষ গদা ঘোরাতে ঘোরাতে মুলোর মতো দাঁত বের করে বুক চিতিয়ে এসে দাঁড়াল?"

"বলি, বাঁশির জন্য বড় লাতন হয়ে পড়লি যে! বাঁশি গেছে যাক, সেজন্য অত ভাবনা নেই। কিন্তু এখন যে ওই বাঁশি বাজানোর জন্য একজন উপযুক্ত বেঁশোও দরকার, সে খেয়াল আছে তোর?"

একগাল হেসে পরাণ বলে, "বেঁশো মানে বাঁশিয়াল তো! সে মেলাই আছে।"

ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে শ্রীনিবাস বলে, "ও বাঁশি বাজানোর এলেম মাত্র একটি লোকেরই আছে। বুড়ো মানুষ রে। এখন তার খোঁজ হবে। আর বুড়ো বয়সের দোষ কী জানিস?"

"কী ওস্তাদ?"

"বুড়ো বয়সে মানুষের প্রাণের মায়া বাড়ে, ভয় বাড়ে, মনের জোর কমে যায়।"

"আজ্ঞে, তা আর জানি না! বুড়ো বয়সে বাতব্যাধি বাড়ে, খাই-খাই বাড়ে, বাইবাতিক বাড়ে, আক্কেল কমে যায়।"

"তাই তো বলছি রে, বাঁশি লোপাট হওয়ার মানে বুড়োটার বিপদ বাড়ল। এখন গুণ্ডা দুটো যদি তাকে খুঁজে বের করে চড়াও হয় তা হলে কি সে ঠেকাতে পারবে? ধর যদি গলায় ছোরা বাগিয়ে ধরে তবে হয়তো বাঁশি বাজানোর কায়দাকানুন শিখিয়েই দিল ভয় খেয়ে।"

পরাণ ফের উত্তেজিত হয়ে বলে, "তা হলে তো সাড়ে সর্বনাশ! ওস্তাদ, তাকে তো এখনই হুঁশিয়ার করা দরকার।"

মাথা নেড়ে শ্রীনিবাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "হুঁশিয়ার করেই বা লাভ কী বল! তার কি আর পালানোর জায়গা আছে!"

পরাণ শ্রীনিবাসের এই হালছাড়া ভাব দেখে মোটেই খুশি হল না। বলল, "কিন্তু একটা কিছু তো করা দরকার ওস্তাদ।"

"তাই তো করছি।"

"কী করছেন ওস্তাদ? মাথায় ফন্দি এল কিছু?"

"এল বইকী। ফন্দিটা এখন বঁড়শির টোপে ঠোকরাচ্ছে। একটু খেলিয়ে তুলতে হবে। সেইজন্যই তো গরম ভাত দিয়ে কাঁচা লঙ্কা টেসে লাউপোস্তটা খাওয়া দরকার। তা হলেই দেখবি ফন্দিটা কপ করে টোপ গিলে লেজ নাড়তে নাড়তে উঠে এসেছে।"

"কিন্তু বুড়োটা কে ওস্তাদ?"

"আছে রে আছে। ধারেকাছেই আছে। কিন্তু সবার আগে লাউপোস্ত।"

পরাণ কাহিল হয়ে হাল ছেড়ে বলল, "তবে লাউপোস্তই হোক।"

কিন্তু খেতে বসেও ভারী আনমনা রইল শ্রীনিবাস। যেমনটা খাওয়ার কথা তেমনটা খেল না। পাতে খানিক ফেলে গম্ভীর মুখে উঠে পড়ল। মাদুরে শোওয়ার পর পরাণ তার গা-হাত খানিক

দাবিয়ে দিয়ে নিজেও মাদুরের একধারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাতে হঠাৎ দরজায় খুট খুট শব্দ। চাপা গলায় কে যেন ডাকল, "শ্রীনিবাস! ও শ্রীনিবাস!"

অভ্যাসবশে পরাণ চট করে হামাগুড়ি দিয়ে মাচার নীচে ঢুকে যাচ্ছিল। শ্রীনিবাস তার কাছা টেনে ধরে একটা হাই তুলে বলল, "ভয় নেই। দরজাটা খুলে দে।"

আতঙ্কিত পরাণ বলে, "দেব? তারা নয়তো!"

"বুড়ো বয়সের দোষ কী জানিস?"

পরাণ রেগে গিয়ে বলে, "জানব না কেন? বুড়োরা কানে কম শোনে, চোখে কম দেখে, বুদ্ধি কমে যায়, মাঝরাতে হুট করে দরজা খুলে দেয়।"

এক গাল হেসে শ্রীনিবাস বলে, "তা ঠিক। তবে বুড়োদের পুরনো কথা মনে থাকে। যা দরজাটা খুলে দে। ও আমার পুরনো বন্ধু ইরফান গাজি।"

পরাণ দরজা খুলতেই ইরফান গাজি টুক করে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার এক হাতে টর্চ অন্য হাতে লাঠি।

শ্রীনিবাস উদাত্ত গলায় বলল, "এসো ইরফান। কতকাল পরে দেখা।"

ইরফান গাজি এসে শ্রীনিবাসের হাত দুটো ধরে ফেলে বলল, "আমার চোখ দুটো এখনও ভাল আছে, বুঝলে? আবছা আলোতে মিটিং-এর এক কোণে তোমাকে বসে থাকতে দেখেই চিনেছি। মনে হল, ও বাঁশি চুরির ব্যাপারের সঙ্গে তোমার একটা যোগ আছে। তাই পাঁচজনের সামনে আর চেনা দিইনি।"

দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে শ্রীনিবাস বলল, "ভালই করেছ। লোকজনের নজরে বেশি না পড়াই ভাল। কিন্তু আমার

খোঁজ পেলে কী করে?"

"বদরুদ্দিন নামে আমার একটা চাকর আছে। আসলে সে চাকর সেজে থাকে। খুব সেবা টেবা করে। সে কিন্তু বড়লোকের ছেলে, চাকর সেজে আমার বাড়িতে ঢুকেছে চুরি করে বাঁশি শিখবে বলে। বড়লোকের ছেলের তো নানা খেয়াল হয়, তাই বদরুদ্দিন জীবনে অনেক কিছুই হতে চেয়েছিল। সাপুড়িয়া হবে বলে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, যাত্রার দলে ভিড়েছিল, চোর হওয়ার জন্য ষষ্ঠী গুণের কাছে তালিম নিয়েছিল।"

পরাণ হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে বলল, "আমার পূজ্যপাদ শ্বশুরমশাই।"

ইরফান বলল, "সেই বদরুদ্দিনকে কাজে লাগাতেই খবর নিয়ে এল। তল্লাটের সব চোরকেই সে চেনে কিনা। তা তোমার ব্যাপারখানা কী বলো তো! বাঁশির সন্ধানে বেরিয়েছ নাকি?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রীনিবাস গম্ভীর গলায় বলল, "সে এক লম্বা কাহিনী ভাই। মোহন রায়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ নবীন রায়ের কাছে তুমিও কিছুদিন তালিম নিয়েছিলে।"

"তা আর নিইনি! তারপর তো বেনারসের আমানুল্লা খাঁ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গৎ করতে চলে যাই, নবীন বাবার কাছে আর শেখা হল না।"

"আমি কিছুদিন বেশি শিখেছিলুম। নবীন রায় একদিন আমাকে ডেকে বললেন, দেখ শ্রীনিবাস, মোহন রায়ের বাঁশি এক সর্বনেশে জিনিস। বংশপরম্পরায় আমরাই শুধু ও বাঁশি বাজাতে জানি, আর কেউ জানে না। আমার ছেলেপুলে নেই, সুতরাং আমি মরলে পরে ও বিদ্যে লোপ পাবে। কিন্তু মুশকিল কি জানিস, বিদ্যেটা কেবলমাত্র আমিই জানি বলে, আমার মনে হয়, মরার পরও আমার প্রাণটা ওই বাঁশিটার কাছে ঘোরাফেরা করবে, আমার আর মুক্তি হবে না।

মন্ত্রশক্তি জিনিসটা বড় ভয়ংকর। তাই ঠিক করেছি ও বিদ্যে আমি তোকেই শিখিয়ে যাব।”

ইরফান উত্তেজিত হয়ে বলে, “বলো কী হে!”

“আমিও ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, ‘ও বাবা, ও আমি শিখব না।’ নবীন রায় বললেন, ‘তোকে ভাল করে জানি বলেই বিশ্বাস করি তুই কোনও অকাজ করবি না। দেখ বাঁশির বিদ্যে কাউকে দিয়ে খালাস হতে না পারলে আমার মুক্তি হবে না। কাউকে শেখাতে পারলেই আমার ছুটি।”

“শিখলে নাকি?”

“হ্যাঁ, রাজবাড়ির মাটির নীচে একটা নিরেট ঘরের সব রন্ধ্র ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে সাতদিন ধরে নিশুত রাতে নবীন রায় আমাকে বাঁশিটা বাজাতে শিখিয়ে দিলেন। শেখানোর সময় আমার কানে তুলো এঁটে দিতেন, যাতে সুরটা কানে না শুনতে পাই। যে বাজায় তার ওপর বাঁশি কোনও ক্রিয়া করে না, কিন্তু যে শোনে তার ক্রিয়া হয়।”

“তারপর?”

“ সাতদিন বাদে বাঁশি বাজাতে শিখে গেলাম।”

“তা কী দেখলে, সত্যিই ওসব হয় নাকি?”

“হয়। নবীন রায় প্রতিদিন একটা করে জীবজন্তু নিয়ে গর্ভগৃহে আসতেন। কখনও কুকুর বা বেড়াল, কখনও ছাগলছানা বা বেজি, কখনও বানর বা পোষা পাখি। প্রথম সুরটা শুনলেই ওরা আনন্দে যেন মাতালের মতো হয়ে যেত। দ্বিতীয় সুরে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ত।”

“আর তৃতীয় সুরে?”

“সেটা বাজালেই ঘরটা যেন দুলে উঠত আর বাইরে থেকে একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ আসত। তিন নম্বর সুরটা অবশ্য খুব অল্প একটু

বাজিয়েই বন্ধ করে দিতেন নবীন রায়। লোকে তেমন টের পেত না।”

“তারপর কী হল?”

“বিদ্যেটা শিখিয়ে দিয়ে নবীন রায় ভারী নিশ্চিন্ত হলেন। বেশিদিন বাঁচেনওনি তারপর। কেতুগড়ের লোক জানল, বিদ্যেটা নবীন রায়ের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে।”

“আহা, থামলে কেন? তারপর কী হল?”

“এই বলছি , একটা লাউপোস্তর ঢেকুর উঠল কিনা। ভাল কিছু খেলে তার ঢেকুরটাও বড় ভাল লাগে, এটা লক্ষ করেছ?”

একগাল হেসে ইরফান গাজি বলে, “তা আর করিনি! এই তো সেদিন ইলিশের মাথা দিয়ে কচুর শাক রান্না হয়েছিল, কী যে ভাল ভাল ঢেকুর উঠল ভাই, তা আর বলার নয়।”

পরাণ বিরক্ত হয়ে বলল, “একটা গুরুতর কথার মধ্যে কেন যে গুচ্ছের বাজে জিনিস ঢুকে পড়ছে কে জানে বাবা।”

শ্রীনিবাস মিটমিট করে তার দিকে চেয়ে বলল, “বুড়ো বয়সের ওটাও একটা দোষ, বুঝলি? এক কথায় আর এক কথা এসে পড়ে। ধৈর্য হারাসনি বাপ, বলছি নবীন রায় মারা যাওয়ার পর আমি কেতুগড় ছেড়ে কাজকর্মে বেরিয়ে পড়লাম। বাঁশির সঙ্গে আর সম্পর্ক রইল না।”

ইরফান গাজি গলা নামিয়ে বলল, “ভাই, কিছু মনে কোরো না। তোমার যা কাজ তাতে তো বাঁশিটা হলে তোমার খুব সুবিধে হয়ে যেত, তাই না!”

একটা ফুঁয়ের শব্দ করে শ্রীনিবাস বলল, “লোককে ঘুম পাড়িয়ে চুরি তো, ও তো লোভী আর আনাড়ি লোকের কাজ। যেমন এই পরাণ দাস। এখনও হাত পায়ের আড় ভাঙেনি, কিন্তু আশা ষোলো আনা। আমাকে কি এলেবেলে চোর পেলে নাকি?”

"আরে না না, ছিঃ ছিঃ!" বলে জিভ কেটে কানে হাত দিল ইরফান। তারপর বলল, "তোমাকে কি আজ থেকে চিনি হে? চুরি তুমি করতে বটে, তবে শিল্পকর্ম হিসেবে। ওটা ছিল তোমার মজা। পেটের ধান্দায় কখনও করোনি। যা রোজগার করেছ তার সবটাই গরিব দুঃখীকে বিলিয়ে দিয়েছ। সব জানি। তুমি একটা সাধারণ চোর হলে এই ইরফান গাজি কি রাত দুপুরে ছুটে আসত তোমার কাছে?"

ফের একটু হাসল শ্রীনিবাস। বলল, "বাঁশি আমি আর ছুঁইনি। বিদ্যেটা শিখেছিলাম ঠিকই, কিন্তু কাজে লাগানোর ইচ্ছেই কখনও হয়নি। তা ছাড়া রাজবাড়ির নুন খেয়েছি, তাদের জিনিস চুরি করে নিমকহারামি করতে পারব না।"

"অতি হক কথা। কিন্তু বাঁশিটা নিয়ে এতদিন বাদে বখেরা বাঁধল কেন?"

"বাঁধারই কথা। মহানন্দকে তো চেনো?"

"তা চিনব না কেন? নায়েব হরনাথ চৌধুরীর অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেটা তো! খুব চিনি। মহা হারমাদ ছেলে।"

"আমি যখন রিটায়ার হয়ে কেতুগড়ের কাছেই ঘর তুলে বাস করতে লাগলুম তখন মহানন্দ লায়েক হয়েছে। ষণ্ডামি গুণ্ডামি করে বেড়ায়। রাজবাড়ির বিস্তর দামি জিনিস চুরি করে বেচে দেয়। রাজা দিগিন্দ্রনারায়ণ বুড়ো হয়েছেন। এখন নিরানব্বই বছর বয়স। একে নিঃসন্তান, তার ওপর রানিমাও গত হয়েছেন। একমাত্র বুড়ো চাকর হরেকেষ্টই যা দেখাশোনা করে। মহানন্দের দৌরাত্ম্য ঠেকানোর সাধ্য বুড়ো রাজার নেই। এমনিতে দিগিন্দ্রনারায়ণ মানুষ খুব ভাল। কিন্তু তাঁর একটা দোষ কী জানো?"

"রাজারাজড়াদের দোষের অভাব কী?"

"সে দোষের কথা বলছি না। তাঁর শুচিবায়ু আছে, ভূতের ভয়

আছে, কিপটেমি আছে, কিন্তু সেসব ধরছি না। যে দোষটা সবচেয়ে গুরুতর, তা হল কোনও গোপন কথা পেটে রাখতে পারেন না। কেউ কোনও গোপন কথা বললেই তাঁর ভীষণ অস্বস্তি শুরু হয়ে যায়। যতক্ষণ না কাউকে বলে দিচ্ছেন, ততক্ষণ পেটে বায়ু জমে ঘন ঘন উদ্‌গার উঠতে থাকে, ক্ষুধামান্দ্য হয়, রাতে ঘুম হয় না, কেবল পায়চারি করেন আর ঘটি ঘটি জল খান আর বিড় বিড় করতে থাকেন। এই জন্য রানিমা পারতপক্ষে তাঁর কাছে কোনও কথা ভাঙতেন না। তা হয়েছে কী, একদিন ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে হরেকেষ্ট নবীন রায়ের ডায়েরির একখানা পাতা কুড়িয়ে পেয়ে সেটা এনে রাজামশাইকে দেয়। তাতে লেখা ছিল যে, নবীন রায় বাঁশির বিদ্যে আমাকে শিখিয়ে গেছেন। ব্যস, এই খবর জানার পর থেকেই বুড়ো মানুষটার অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল। ঢেকুর, পায়চারি, জল, অনিদ্রা, অরুচি, হাই প্রেশার। কাউকে কথাটা না বললেই নয়। একদিন থাকতে না পেরে তাঁর পোষা কাকাতুয়াটাকেই বলে দিলেন, বাঁশির বিদ্যে শ্রীনিবাস জানে। আর হতভাগা কাকাতুয়াটা তারস্বরে সেটা সারাদিন বলতে থাকে। ধূর্ত মহানন্দ আঁচ পেয়ে গিয়ে দিগিন্দ্রনারায়ণের ওপর চড়াও হল। এমনকী তরোয়াল বের করে ভয় দেখাল। দিগিন্দ্রনারায়ণ তখন নবীন রায়ের ডায়েরির পাতাটা তাকে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।”

“এঃ হেঃ, তা হলে তো বিপদ হল হে!”

“বিপদ তো হলই। তবে রাজামশাইয়ের খুব আত্মগ্লানিও হল। মহানন্দ যখন দলবল নিয়ে গোটা এলাকায় আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন রাজামশাই গোপনে হরেকেষ্টকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে আনিয়ে হাউমাউ করে আমার হাত ধরে বললেন, ‘তোর কাছে বড় অপরাধ করে ফেলেছি রে। মহানন্দ তোর ওপর বড় অত্যাচার করবে, তারপর দেশ ছারখার করতে শুরু করবে। তা তুই আমার

মুখ রক্ষে কর। মহানন্দ বাঁশি কড়া পাহারায় রেখেছে। ও বাঁশি তোকে চুরি করতে হবে। বাঁশি নিয়ে তুই দূরে কোথাও পালিয়ে যা।' তা আমি বললুম, 'মহারাজ, আমি যে রিটায়ার হয়েছি। বয়সও হল।' মহারাজ বললেন, 'বুড়ো হলে কী হয়, এ তোর বাঁ হাতের কাজ। আমি তোকে এ কাজের জন্য মজুরিও দেব। আমাকে বাঁচা, রাজি হয়ে যা।"

"রাজি হলে বুঝি?

"হলুম। প্রস্তাবটা তো খারাপ নয়।"

"ও, তা হলে তুমিই রাজবাড়ির চুরি-যাওয়া জিনিস ময়নাগড়ের বাড়ি বাড়ি ফিরি করে বিক্রি করেছ! বদরুদ্দিন বলছিল বটে, একজন বুড়ো ফিরিওলা ময়নাগড়ে কোন রাজবাড়ির জিনিস খুব শস্তায় বিক্রি করে গেছে।"

"শস্তায় না দিলে গাঁয়ের মানুষ কিনবে কেন বলো!"

"তা তো বুঝলুম, কিন্তু চালে কি একটু ভুল হল না?"

"চালে ভুল! তো বুড়ো হয়েছি, ভুলভাল হতেই পারে। কী ভুল হল বলো তো!"

ইরফান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ভুল নয়? বাঁশিটা হাতছাড়া হল যে!"

শ্রীনিবাস চিন্তিত মুখে বলল, "হাতছাড়া কি সহজে হতে চাইছিল বাঁশিটা? বটেশ্বর সেটা এমন লুকিয়ে রেখেছিল যে, মহানন্দ সারা জীবনেও খুঁজে বের করতে পারত না। তারপর বাঁশি বাজাতে যেত আবার ভুতুড়ে দীঘির ধারে, যেখানে জনমনিষ্যি যায় না। তাই বাঁশিটা যে বটেশ্বরের কাছে আছে সে খবরটা আমিই মহানন্দকে দিয়েছিলুম।"

"তুমি!" বলে হাঁ হয়ে গেল ইরফান।

মৃদু হেসে শ্রীনিবাস বলে, "তা ছাড়া উপায় কী বলো। বেচারা বাঁশির হদিশ পেতে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছিল যে। তাই একদিন

হাটখোলার কাছে অন্ধকারে সাধু সেজে তার পথ আটকে বললুম, পাঁচটা টাকা দে। তা হলে যা খুঁজছিস তার হদিশ পেয়ে যাবি। একটু কিন্তু-কিন্তু করছিল বটে, তবে দিয়েওছিল। তখন বললুম সন্ধের পর ময়নাদিঘির ধারে যাস, পেয়ে যাবি।”

ইরফান গম্ভীর হয়ে বলল, “কাজটা ভাল করোনি শ্রীনিবাস। খবরটা দিয়েছিলে বলে যে বটেশ্বর মরতে বসেছিল! সময় মতো আমি গিয়ে পড়েছিলুম বলে রক্ষে। ঠ্যাঙার ঘা খেয়ে পালিয়েছিল, নইলে—”

শ্রীনিবাস দুলে দুলে একটু হেসে বলে, “বাপু, ঠ্যাঙার ঘা-টা তুমি জব্বর দিয়েছিলে বটে। নিজের চোখেই তো দেখলুম। তবে তোমার ঠ্যাঙার সঙ্গে আমার গুড়ুলও ছিল যে!”

“অ্যাঁ। বলো কী!”

“বাবলা ঝোপের আড়াল থেকে এই এতবড় একখানা গুড়ুল গুলতিতে ভরে মারলুম যে! তোমার ঠ্যাঙার ঘাও পড়ল, আমার গুড়ুলও গিয়ে গুণ্ডাটার কপালে লাগল। তোমার ঠ্যাঙার জোর বেশি, না আমার গুড়ুলের জোর বেশি তা বলতে পারব না। তবে কাজ হয়েছিল।”

“বটে!”

বটতলার অন্ধকার রাস্তা দিয়ে জনাদশেক লোক ময়নাগড়ে ঢুকছিল। সকলের সামনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা নরেন্দ্রনারায়ণ। তার এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে ধুতির কোঁচাখানা মুঠো করে ধরা। পিছনে দু'জনের হাতে বন্দুক, দু'জনের হাতে খোলা তলোয়ার, দু'জনের হাতে সড়কি আর বাকিদের হাতে লম্বা লম্বা লাঠি। প্রত্যেকেরই বিরাট বিরাট শরীর। তারা ভারী ভারী পায়ের শব্দ তুলে বুক ফুলিয়েই ঢুকছে।

বটতলা পেরোতেই টর্চের আলো এসে পড়ল তাদের ওপর। প্রভঞ্জন ডাক্তার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "কে রে? কারা তোরা?" বলে তেড়ে এসেই টর্চের আলোয় লোকগুলোর মূর্তি দেখে ভারী নরম হয়ে পড়ল প্রভঞ্জন। মোলায়েম গলায় বলল, "আসুন, আসুন। কাকে খুঁজছেন বলুন তো! ও ব্রজ, দ্যাখো এঁরা কার বাড়ি যাবেন, বরং সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসো।"

নরেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর গলায় বলল, "তার প্রয়োজন হবে না। বাড়ি আমরা চিনি।"

নগেন পাল বিগলিত হয়ে বলল, "তা চিনবেন বইকী, এ তো আপনারও গ্রাম। তা হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন বুঝি! খুব ভাল। যা গরমটা পড়েছে আজ!"

লোকগুলো প্রভঞ্জনের দলের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে সদর্পে এগিয়ে গেল।

হাটখোলার কাছে হ্যাজাক জ্বেলে কালীপদর দলবল ওত পেতে ছিল। উটকো লোকজন দেখে সবাই 'রে রে' করে উঠল। কিন্তু দলটা কাছে আসতেই তাদের মূর্তি দেখে কালীপদ তটস্থ হয়ে বলে, "নরেন্দ্রনারায়ণবাবু যে! তা শরীর গতিক ভাল তো! বাড়ির সবাই ভাল আছে? খোকাখুকিদের খবর সব ভাল? আর গিন্নিমা! হেঃ হেঃ, আজকাল তো আর দেখাই পাই না আপনার! মাঝে-মাঝে চলে আসবেন এরকম হুটপাট করে। আমরা তো আর পর নই।"

নরেন্দ্রনারায়ণ তার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে গটগট করে এগিয়ে যেতে লাগল, পিছনে তার বাহিনী।

কে একজন যেন জিজ্ঞেস করল, "কারা এরা কালীপদদা?"

"চিনলি না? বিরাট লোক! বিরাট লোক।"

আর কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করল না।



তিন নম্বর দলটার সঙ্গে দেখা হল রথতলায়। নবু কালীবাড়ি থেকে বলির খাঁড়াটা ধার করে এনেছিল। সেটা বেজায় ভারী বলে খাঁড়াটা মাটিতে শুইয়ে তার ওপর বসে চারদিকে নজর রাখছিল। সামনে হঠাৎ লোকজন সাড়া পেয়ে খাঁড়া হাতে উঠে গর্জন করল, "খবর্দার! আর কাছে এলেই কিন্তু এসপার ওসপার হয়ে যাবে, এই বলে রাখলুম!"

কিন্তু দলটা কাছে আসতেই নবু খ্যালখ্যাল করে হেসে বলল, "আপনারা! তাই বলুন। আমি ভাবলাম কে না কে যেন! তা গোবিন্দপুরে কেনারাম বিষয়ীর মেয়ের বিয়েতে যাচ্ছেন তো! হ্যাঁ, এই রাস্তাই। সামনে এগোলে বাঁ হাতে রাস্তা পাবেন, মাইলটাক গেলেই গোবিন্দপুর। জব্বর খাইয়েছে মশাই, মাছের কালিয়াটা যা হয়েছে না..."

নরেন্দ্রনারায়ণ একটু ভ্রূকুটি করে তার দিকে চাইতেই নবু চুপসে গেল।

প্যাংলা ঠিকমতো ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়নি। একটা ষণ্ডা তাকে কনুইয়ের একটা রাম-গুঁতোয় ছিটকে ফেলে দিল। যন্ত্রণায় কোঁক করে উঠল সে। পরমুহূর্তেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে উদ্বেগের সঙ্গে বলে উঠল, "আপনার ব্যথা লাগেনি তো ভাই? আহা, আমার বুকে গুঁতো খেয়ে কচি হাতটা বোধহয় জখম হল ছেলেটার!"

এর মধ্যেই দুটো ছেলে দৌড়ে গিয়ে বিষ্ণুরামকে খবর দিল, "বড়বাবু, গাঁয়ে দশ-বারোজন লোক ঢুকে পড়েছে।"

বিষ্ণুরাম রাতে বারোখানা পরোটা খায়, সঙ্গে মাংস, শেষপাতে ক্ষীর আর মর্তমান কলা। মাত্র পাঁচ নম্বর পরোটাটি ছিঁড়ে মাংসের ঝোলে ডুবিয়েছে, এমন সময় উটকো ঝামেলা।

বিষ্ণুরাম উঠে জানালার পাল্লা সাবধানে ফাঁক করে বলল, "কী হয়েছে?"

ছেলেদুটো হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ভীষণ বিপদ বড়বাবু, গাঁয়ে দশ বারোজন লোক ঢুকে পড়েছে যে!"

বিষ্ণুরাম বিজ্ঞের মতো হেসে বলল, "হ্যাঁ রে, পেনাল কোডে কোন ধারায় বলা আছে যে, গাঁয়ে লোক ঢোকা বারণ?"

"আজ্ঞে, তা তো জানি না।"

"ওইটেই তো তোদের মুশকিল। কিছু জানিস না, না জেনেই চেঁচামেচি করিস। ওরে বাপু, আমি হলুম আইনের রক্ষক। আইন ছাড়া আমি এক পাও চলতে পারি না। লোক যদি ঢুকে থাকে তো কী হয়েছে? ঢুকতে দে না। কত আর ঢুকবে?"

"কিন্তু বড়বাবু, তাদের হাতে বন্দুক আছে, তরোয়াল আর লাঠি আছে।"

ভ্রূ কুঁচকে বিষ্ণুরাম বলল, "অস্ত্র থাকলেই তো হবে না। তাদের উদ্দেশ্য কী তা বুঝতে হবে। খুনজখম যদি নিতান্তই হয় তখন না হয় কাল সকালে দেখা যাবে। তোরা বরং পরিস্থিতির ওপর নজর রাখ। যা-ই ঘটুক, সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা কর। আমি তো তোদের পিছনেই আছি।"

ছেলে দুটো বিমর্ষ মুখে ফিরে গেল।

বিষ্ণুরাম ধীরে সুস্থে মাংস পরোটা আর ক্ষীর খেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ওদিকে নরেন্দ্রনারায়ণ তার দলবল নিয়ে যখন পরাণ দাসের বাড়িতে হাজির হল তখন চারদিক সুনসান। বিভীষণের মতো চেহারার একটা লোকের এক ধাক্কাতেই দরজাটা মড়াত করে খুলে গেল। নরেন্দ্রনারায়ণ টর্চ ফেলে দেখল, মেঝেতে মাদুর পেতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে শ্রীনিবাস।

গম্ভীর গলায় সে ডাকল, "শ্রীনিবাস!"

শ্রীনিবাস এক ডাকেই উঠে পড়ল। চোখ মিটমিট করে চেয়ে

বলল, "মহানন্দবাবু যে! সঙ্গে এত লোকজন কেন বলুন তো! অস্ত্রশস্ত্রই বা কেন?"

"আমি তোমাকে ভয় দেখাতে আসিনি শ্রীনিবাস। বরং তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করতেই এসেছি।"

"কীসের চুক্তি?"

"আমার মনে আছে, অনেক দিন আগে আমি যখন ছোট ছিলুম তখন তুমি আমাকে আড়বাঁশি বাজাতে শিখিয়েছিলে। মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"আজ আবার তোমার কাছে বাঁশি শিখতে এসেছি। এই বাঁশিটা।" বলে নরেন্দ্রনারায়ণ ওরফে মহানন্দ মোহন রায়ের বাঁশিটা বের করে দেখাল।

শ্রীনিবাস নিরুত্তাপ চোখে বাঁশিটা দেখে চোখ ফিরিয়ে নিল।

নরেন্দ্রনারায়ণ বলল, "বাঁশিটা চেনো?"

"চিনি মহানন্দবাবু।"

"চেনারই কথা। বাঁশিটা চুরি করে তুমি আমাকে অনেক দৌড়ঝাঁপ করিয়েছ।"

শ্রীনিবাস উদাস গলায় বলল, "ভালর জন্যই চুরি করেছিলাম।"

"কার ভালর জন্য শ্রীনিবাস? এ বাঁশির জোরে রাজা হওয়া যায়। কিন্তু তুমি তো তা হওনি। ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কী ভালটা হল তোমার?"

তেমনি উদাস গলায় শ্রীনিবাস বলে, "সবার ভাল কি একরকম?"

"তোমার ভালটা কীরকম তা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। একসময়ে তুমি নামকরা চোর ছিলে। শুনতে পাই, তুমি নাকি লাখো লাখো টাকা রোজগার করেছ। কিন্তু দান-খয়রাত করে সব উড়িয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে একখানা কুঁড়ে ঘরে মাথা গুঁজে পড়ে থাকো। উলোঝুলো পোশাক পরো, ভালমন্দ খাবার জোটে না, লোকে

খাতির করে না, সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওনি, তা হলে ভালটা কী হয়েছে বলতে পারো? তুমি তো আর সাধু-সন্ন্যাসী নও।"

শ্রীনিবাস নিস্পৃহ গলায় বলল, "সাধু হওয়া কি সোজা?"

"শোনো শ্রীনিবাস, আমি জানি না তুমি পাগল, নাকি বোকা, নাকি বৈরাগী। তবে তুমি যে একটি অদ্ভুত লোক তাতে সন্দেহ নেই। এভাবে বেঁচে থাকতে কি তোমার ভাল লাগে? বুড়ো হয়েছো, এখন একটু ভোগসুখ করতে ইচ্ছে যায় না? ধরো যদি অসুখবিসুখ করে, বিছানায় পড়ে যাও তা হলেই বা কে তোমাকে দেখবে, ডাক্তার বদ্যিরই বা কী ব্যবস্থা হবে, এসব ভেবেছ? তোমার তো তিনকুলে কেউ নেই, একা মানুষ, হাতে টাকা পয়সা না থাকলে তোমার গতিটা কী হবে জানো?"

শ্রীনিবাস একটু হেসে বলল, "তা আর ভাবি না? খুব ভাবি। ভেবে ভয়ও হয় খুব। তুমিও যে আমার কথা এত ভাবো তা জেনে বড় ভাল লাগল।"

"ইয়ার্কি নয় শ্রীনিবাস, আমি ভাবের ঘোরে চলি না। আমি কাজের লোক। হাতে ক্ষমতা পেয়েও যদি কেউ সেই ক্ষমতা কাজে না লাগায় তা হলে সে আহাম্মক। এই যে অদ্ভুত বাঁশিটা দেড়শো বছর ধরে রাজবাড়িতে পড়ে আছে এটা কি ঠিক হচ্ছে? মোহন রায় অনেক মাথা খাটিয়ে, বিস্তর মেহনতে এটা তো ফেলে রাখার জন্য তৈরি করেননি! তাঁর অপোগণ্ড বংশধরেরাও বাঁশিটা কেউ কাজে লাগায়নি। এখন দুনিয়ার তুমিই একমাত্র লোক যে এই বাঁশির বিদ্যেটা জানো। তুমি মরে গেলে এই বাঁশি চিরকালের মতো বোবা হয়ে যাবে। এত বড় একটা সম্পদ নষ্ট হবে। ভেবে দ্যাখো শ্রীনিবাস। বিদ্যেটা দিয়ে যাও, বাঁশিটা সার্থক হোক।"

"বিদ্যেটা শিখে তুমি কী করবে মহানন্দবাবু?"

"তোমাকে মিথ্যে কথা বলব না। লোককে ঘুম পাড়িয়ে এলাকা

লুট করার মতো ছোট নজর আমার নয়। কথা দিচ্ছি, সাধারণ মানুষের ধনসম্পত্তিতে আমি হাতও দেব না। আমি বন্দোবস্ত করব সরকার বাহাদুরের সঙ্গে।"

অবাক হয়ে শ্রীনিবাস বলল, "সেটা কী রকম?"

"আমি জানি, তিন নম্বর সুরে প্রলয় কাণ্ড হয়। ঘূর্ণি ঝড় ওঠে, বান ডাকে, ভূমিকম্প হয়। ধরা যাক, আমি সরকার বাহাদুরকে খবর দিলাম, অমুক দিনের মধ্যে আমাকে একশো কোটি টাকা না দিলে অমুক দিন অতটার সময় অমুক জায়গায় প্রলয়ংকর কাণ্ড এবং ভূমিকম্প হবে। সরকার প্রথমে পাত্তা দেবে না। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে, ঠিক সময়ে সেই জায়গায় যদি তাই হয় তা হলে সরকার নড়েচড়ে বসবে। দু'বার বা তিনবার একই কাণ্ড ঘটলে তখন আর সরকার চুপ করে থাকতে পারবে না। ভয় পেয়ে আমার দাবি মিটিয়ে দেবে। তোমাকে কথা দিচ্ছি আমার রোজগারের চার আনা ভাগ তোমার। ভাল করে ভেবে দ্যাখো. এ কাজে খারাপ কিছু নেই। টাকাটা দেবে সরকার। আর সরকারের টাকার ওপর হক তো আমাদের আছেই। ঠিক কি না!"

হঠাৎ মুখটা উজ্জ্বল হল শ্রীনিবাসের। সে দুলে দুলে হেসে বলল, "খুব ঠিক। আমি ভাবছি, সরকার টাকাটা পাবে কোথায়। যতদূর শুনেছি, সরকারের টাকা আসলে দেশের মানুষেরই টাকা। তাই নাকি মহানন্দবাবু?"

মহানন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, "সরকারের কত টাকা নয়ছয় হয় তুমি জানো? কত লোক সরকারি তহবিলের টাকা লুটমার করে নিচ্ছে! তা হলে আমাদের দোষ হবে কেন? সরকারি টাকা আসলে বেওয়ারিশ জিনিস। ও নিলে দোষ হয় না।"

"আমাকে সিকিভাগ দিতে চাও?"

"চাইলে আধাআধি বখরাও হতে পারে।"

ভ্রূ কুঁচকে মহানন্দের দিকে চেয়ে শ্রীনিবাস ঠান্ডা গলাতেই বলল, "আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে দেবে মহানন্দবাবু?"

"কী কথা?"

"আমাকে তুমি বখরাই বা দেবে কেন? ধরো বাঁশির বিদ্যে যদি আমি তোমাকে শিখিয়েই দিই তা হলে আমাকে বাঁচিয়েই বা রাখবে কেন তুমি? বুদ্ধিমান মানুষ কি তা করে?"

"তুমি ভাবছ বিদ্যেটা শিখে নিয়ে আমি তোমাকে মেরে ফেলব?"

"যুক্তি তো তাই বলে। শত্রুর কি শেষ রাখতে আছে?"

"আমি কথা দিলেও তুমি বিশ্বাস করবে না?"

"বিশ্বাস করার কারণ নেই যে।"

মহানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাকে ভাঙা যে সহজ হবে না তা আমি জানি। তোমার মৃত্যুভয়ও নেই। তবে তোমার একটা দুর্বলতার খবর আমি রাখি শ্রীনিবাস।"

"তাই নাকি?"

"কেতুগড়ে তোমার পাশের বাড়িতে একটা ছোট পরিবার থাকে। নয়নচাঁদ আর তার বউ বিষাণী। তাদের একটা বছর পাঁচেকের ফুটফুটে ছেলে আছে, তার নাম গোপাল। তোমার এতদিন সংসারের কোনও মায়ার বন্ধন ছিল না। কিন্তু ওই গোপাল হওয়ার পর থেকে বিষাণী বাচ্চাটাকে তোমার কাছে রেখে ঘর-গেরস্থালির কাজ করত। আর তুমি গোপালকে কোলেপিঠে করে এত বড়টি করেছ। এখন সে তোমার নয়নের মণি, আর গোপালও দাদু ছাড়া কিছু বোঝে না। এখন ও তোমার হাতে খায়, তোমার কাছে ঘুমোয়।"

শ্রীনিবাসের মুখটা ধীরে-ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে ধরা গলায় বলল, "কী বলতে চাও মহানন্দবাবু?"

"গোপালের ভাল-মন্দের জন্যই বলছি, আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়াই সকলের পক্ষে মঙ্গল। যদি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও

আমি তোমাকে মারব না শ্রীনিবাস, কিন্তু গোপালকে তুলে নেব। তারপর যে ক'দিন তুমি বাঁচবে দগ্ধে দগ্ধে মরবে। এখনও ভেবে দ্যাখো।"

শ্রীনিবাস কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধরা গলায় বলল, "মহানন্দবাবু, আমি জানি বিদ্যেটা শেখার পর তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। মরতে আমার ভয়ও নেই। শুধু বলি, শেষবারের মতো ভেবে দেখো, ওই সর্বনেশে বাঁশি কাজে লাগাবে কি না।"

"আমার ভাবা হয়ে গেছে শ্রীনিবাস। আমি তোমাদের মতো বোকা নই। সম্পদ কাজে না লাগানোও অন্যায়।"

শ্রীনিবাস হাত বাড়িয়ে বলল, "বাঁশিটা দাও। আর ঘর থেকে ওদের বেরিয়ে যেতে বলো।"

মাঝরাত্তিরে হঠাৎ কাতুকুতু খেয়ে গাঢ় ঘুম থেকে জেগে উঠল বিষ্ণুরাম, ভারী অবাক হয়ে বলল, "এ কী রে! কাতুকুতু দেয় কে? অ্যাঁ! আরে, আমার কাতুকুতু লাগছে কেন? কী মুশকিল!"

কে একটা চাপা গলায় ধমক দিল, "চোপ! উঠে পড়, সময় নেই।"

বিষ্ণুরাম ভয় খেয়ে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, "কে রে তুই? চোর নাকি রে? অ্যাঁ! চোর? ওরে বাপু, দারোগার বাড়িতে চুরি করতে ঢুকলে কী হয় জানিস? পেনাল কোডে লেখা আছে, দারোগার বাড়িতে চুরি করলে ফাঁসি হয়। বুঝলি!"

"বুঝেছি। কিন্তু আমার ফাঁসি হওয়ার উপায় নেই। উঠে পড়, নইলে আবার কাতুকুতু দেব।"

বিষ্ণুরাম ভয় পেয়ে উঠে পড়ল। অন্ধকারে খাটের পাশে একটা আবছা মতো মানুষকে দেখে সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "ওরে,

গাঁয়ে তো আরও বাড়ি আছে, সেখানে যা না। যা বাবা, যত পারিস চুরি কর গে, কিচ্ছু বলব না। ওরে, আমি কি কখনও তোদের কাজে বাগড়া দিয়েছি, বল।"

"জানি, তুই হলি ষাঁড়ের গোবর। পোশাক পরে পিস্তলটা হাতে নে।"

"আমাকে হুকুম করছিস! সাহস তো কম নয়! তুই কে রে?"

"আমি মোহন রায়।"

"সেটা আবার কে?"

"বেশি কথার সময় নেই। বাঁশি শুনতে পাচ্ছিস?"

"বাঁশি!" বলে একটু অবাক হয়ে বিষ্ণুরাম চুপ করল। বাস্তবিক একটা ভারী অদ্ভুত সুরেলা শব্দ যেন বাতাসে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। শুনলে যেন রক্ত নেচে ওঠে।

বিষ্ণুরাম বলল, "বাঃ, বেশ বাজায় তো!"

"এটা এক নম্বর সুর।"

"তার মানে?"

"মানে বলার সময় নেই। দরজা খুলে বেরো, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

"কিন্তু তোকে এত আবছা দেখছি কেন? স্বপ্ন নাকি?"

"না। স্বপ্ন নয়, আমাকে আবছাই দেখা যায়।"

"তা যেতে হবে কোথায়?"

"কাজ আছে। কথা না বলে বেরিয়ে পড়।"

বিষ্ণুরামের হঠাৎ মনে হল, এ লোকটা যে সে লোক নয়। ভারিক্কি গলা, বেশ দাপট আছে, কেউকেটা কেউ হবেও বা। সে একটু নরম হয়ে বলল, "তা না হয় যাচ্ছি, কিন্তু আপনার পরিচয়টা?"

"পরে হবে। ওই যে দু'নম্বর সুর বাজছে।"

বিষ্ণুরাম পথে বেরিয়ে সামনের আবছা লোকটার পিছু পিছু

যেতে শুনতে পেল, বাঁশির সুরটা পালটে গেছে। ভারী নেশাড়ু একটা সুর চারদিকে যেন ঘুম-ঘুম ভাব ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিষ্ণুরাম একটা হাই তুলতে গিয়ে দেখল, রাস্তায় ঘাটে, মাঠে, ময়দানে, এখানে সেখানে লোকজন শুয়ে ঘুমোচ্ছে। গরমে লোকে ঘরের বাইরে অনেকে ঘুমোয় বটে, কিন্তু পথেঘাটে এরকম পড়ে থাকে না তো!

বিষ্ণুরাম সভয়ে বলল, "মোহনবাবু, এরা কি মরেটরে গেছে, নাকি!"

"না। দু নম্বর সুর শুনলে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।"

"তা হলে আমি ঘুমোচ্ছি না কেন?"

"তোর ওপর সুরটা ক্রিয়া করছে না, আমি সঙ্গে আছি বলে।"

"ঘুমোতে দিচ্ছেন নাই-বা কেন?"

"তুই না এলাকার শান্তিরক্ষক?"

"আহা, শান্তিরক্ষকদের কি ঘুমোতে নেই?"

"সারাক্ষণ তুই তো ঘুমিয়েই থাকিস। তোর চোখ ঘুমোয়, মন ঘুমোয়, বিবেক ঘুমোয়, বুদ্ধি ঘুমোয়। আজ তোর জেগে ওঠার পালা।"

"আপনার কথা শুনে ভয়-ভয় করছে যে!"

"আজ ভয় পেলে চলবে না। আয়।"

হঠাৎ বাঁশির সুরটা পালটে একটা ভয়ংকর ভয়াল সুর বেজে উঠল। যেন পেতনির কান্না। হঠাৎ যেন হাহাকারে ভরে গেল চারদিক। হঠাৎ প্রলয়ের শব্দ তুলে হুহুঙ্কারে ছুটে আসছিল ঘূর্ণি ঝড়ের শব্দ। সেই সঙ্গে বিপুল জলের কলরোল।

বিষ্ণুরাম চেঁচাল, "কী হচ্ছে বলুন তো মোহনবাবু!"

"তিন নম্বর সুর।"

হঠাৎ পায়ের তলার মাটি দুলতে লাগল দোলনার মতো। মড়মড় শব্দ উঠল গাছের ডালপালায়, পাখিরা তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, আকাশে ঝলকাতে লাগল বিদ্যুৎ।

তারপর আচমকাই সব শব্দ থেমে গেল। মাটির দোলন থেমে স্থির হল।

"তাড়াতাড়ি আয়। এবার বিপদ।"

"বিপদ! তা বিপদের মধ্যে আমাদের যাওয়া কি ভাল হচ্ছে?"

"পিস্তল বাগিয়ে আয়।"

লোকটা এত জোরে হাঁটছে যেন মনে হচ্ছে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। বিষ্ণুরাম প্রাণপণে হেঁটেও তাল রাখতে পারছে না। থেমে যে উলটোদিকে পালাবে তারও উপায় নেই। একটা চুম্বকের মতো টান যেন তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে।

সামনে থেকে মোহন রায় কেবল বলছে, "আয়, তাড়াতাড়ি আয়।"

* * *

বাঁশি থামতেই মহানন্দ শ্রীনিবাসের হাত থেকে বাঁশিটা কেড়ে নিয়ে হাসল। তারপর দুই কানের ভিতর থেকে দুটো তুলোর টিপলি বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "আজ চোখ আর কানের বিবাদভঞ্জন হল হে শ্রীনিবাস। তোমারও কাজ শেষ হয়ে গেল।"

শ্রীনিবাস জ্বলজ্বল করে চেয়ে ছিল মহানন্দের দিকে। বলল, "বিদ্যে তো পেয়ে গেলেন। কিন্তু মনে রাখবেন ওই বাঁশি এক মহৎ শিল্পের কাজ, এক দারুণ কারিগরের। পৃথিবীতে এমনটা আর হয়নি, হবেও না। ওটা দিয়ে মোটা দাগের কাজ করলে পস্তাতে হবে।"

মহানন্দ একটু হেসে পাঞ্জাবির ঝুল পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে শ্রীনিবাসের দিকে চেয়ে বলল, "এই বিদ্যের ভাগীদার থাকা কি ভাল শ্রীনিবাস?"

শ্রীনিবাস একটু হেসে বলল, "আমার কাজ ফুরিয়েছে মহানন্দবাবু। গুলিটা চালিয়ে দিন।"

রিভলভারের শব্দ হল।

কিন্তু শ্রীনিবাস অবাক হয়ে দেখল, সে নয়, তার বদলে মহানন্দই

উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। পিঠ থেকে রক্তের একটা ধারা নেমে আসছে মেঝেতে। আর দরজায় খোলা ধোঁয়ানো রিভলভার হাতে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণুরাম দারোগা। তার চোখে ভারী অবাক দৃষ্টি।

* * *

পরদিন সকালে নয়নতারা বলল, "দিন তো বাবা, ওই অলক্ষুণে বাঁশিটা উনুনে গুঁজে দিই।"

মৃদু আপত্তি করে পরাণ বলল, "আহা, কটা দিন থাক না হাতে। বেশি কিছু তো নয়, একখানা দোতলা বাড়ি, পনেরো বিশ বিঘে ধানী জমি, দুটো দুধেল গাই..."

শ্রীনিবাস বাঁশিটার গায়ে আদরে হাত বুলিয়ে বলল, "এমন শিল্পকর্ম কি নষ্ট করতে আছে রে! যেখানকার জিনিস সেখানেই ফিরিয়ে দিয়ে আসব।"

পরাণ বলল, "ছোটখাটো দু'একটা কাজ কারবার করে নিলে হয় না বাবা?"

শ্রীনিবাস ঝোলা খুলে কয়েকটা মোহর, সোনার রেকাবি, রুপোর বাসন বের করে দিয়ে বলল, "এগুলো বেচে যা পাবি তাই দিয়ে একটা দোকান দে। চুরির ধাত তোর নয়, ও তোর হবে না।"

জিনিসগুলো দেখে পরাণ ভারী আহ্লাদিত হয়ে বলল, "এ থেকে আপনাকে কত ভাগ দিতে হবে বাবা?"

শ্রীনিবাস মৃদু হেসে বলে, "ভাগ দিবি? ভাগ করলে সব জিনিসই তো ছোট হয়ে যায় রে। আমার কি অল্পে হয়? অল্পে আমার মন ভরে না বলে ভগবান যে আমাকে গোটা বিশ্ব সংসারটাই দিয়ে রেখেছেন! ভাগ নিয়ে তোরা থাক।"


9 788177 563917

মোহন রায়ের বাঁশি • শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

